সিগনেট প্রেস
কলকাতা ২৩

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬১
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
২৫।৪ একবালপুর রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট ও ছবি
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ্
১১৬, বিবেকানন্দ রোড
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
লালচাঁদ রায় অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ
৭/১ গ্রাণ্ট লেন

দাম চার টাকা

সূচীপত্র

ঝালাপালা ... ৭

লক্ষ্মণের শক্তিশেল ... ৫১

অবাক জলপান ... ৮১

হিংস্টুটে ... ৯৭

চলচিত্তচঞ্চরি ... ১০৯

ভাবুকসভা ... ১৫৫

শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম ... ১৬৩

ঝালাপালা

ঝালাপালা

পাত্রগণ

পণ্ডিতমশায়
ঘটিরাম, ছাত্র
কেষ্টা, ছাত্র
পুলিস
খেঁটুরাম, জমিদারের মোসাহেব
ছুলিরাম, জমিদারের মোসাহেব
কেবলচাঁদ, ওস্তাদ
রামকানাই, জমিদার-ভৃত্য
কেদারকৃষ্ট, জমিদারের মামা
জুড়ির দল

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি। জুড়ির প্রবেশ ও গান]

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ
ছাত্র দুটি করে পাঠ
পড়ায় নাইরে মন
সবাই হচ্ছে জ্বালাতন!
অতি ডেঁপো দুকান কাটা
ছাত্র দুটি বেজায় জ্যাঠা
কাউকে নাহি মানে
সবাই ধরো ওদের কানে!
গুরুমশাই টিকিওয়ালা
নিত্যি যাবেন ঝিঙেটোলা
জমিদারের বাড়ি—
সেথা আড্ডা জমে ভারি!

[জুড়ির প্রস্থান। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। (স্বগত) রোজ ভাবি জমিদারমশাইকে বলে কয়ে তার বাড়িতেই একটা টোল বসাব। তা একটু নিরিবিলি যে কথাটা পাড়ব, সে আর হয়ে উঠল না। যেসব বাঁদর জুটেছে, দুটো বাজে কথা বলবার কি আর যো আছে? এই জন্যেই বলি, ন্যায়শাস্ত্র যে পড়েনি সে মানুষই নয়— সে গরু, মর্কট!

[নেপথ্যে ওস্তাদী গানের আওয়াজ]

এই আবার চলল! এ এখন সারাদিন চলতে থাকবে! গলা তো নয়, যেন ফাটা বাঁশ! গানের তাড়ায় পাড়াসুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি কচ্ছে—কাগটা পর্যন্ত ছাতে বসতে ভরসা পায় না—অথচ ভাবখানা দেখায় এমনি, যেন গান শুনিয়ে আমাদের সাতচৌদ্দং তিপান্ন পুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছে। আ মোলো যা—

[ঘটিরামের প্রবেশ]

এত দেরি হল কেন? এতক্ষণ কী কচ্ছিলি?

ঘটিরাম। আজকে শিগগির-শিগগির ছুটি দিতে হবে।

পণ্ডিত। বটে! অনেক দিন পিঠে কিছু পড়েনি বুঝি! ছুটি কিসের?

ঘটিরাম। তাও জানেন না! ও-পাড়ায় গানের মজলিস হবে যে! বড়-বড় ওস্তাদ—

পণ্ডিত। না, না, ছুটি পাবিনে, যা! পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এসেই ছুটির খোঁজ!

ঘটিরাম। বাঃ! ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু আসবেন!

পণ্ডিত। লাটসাহেব এলেও যেতে পাবিনে। কেষ্টা কোথায়?

ঘটিরাম। জানিনে। ডেকে আনব? যাই?—ওরে কেষ্টা!

পণ্ডিত। থাক্ থাক্, ডাকতে হবে না। ওখেনে বসে পড়।

ঘটিরাম। 'অল্ ওয়ার্ক্ অ্যান্ড্ নো প্লে মেক্স্ জ্যাক্ এ ডাল্ বয়'—বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেন না, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়। হ্যাঁ,

হ্যাঁ, বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেন্ না, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—স্ফূর্তিটূর্তি সব মাটি। কেন না, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—এই আমাদের যেমন হয়েছে। কেন না—

পণ্ডিত। ও-জায়গাটা পাঁচশোবার করে পড়তে হবে না। তোর অন্য পড়া নেই?—ঐ যে পুলিসটা যাচ্ছে! ওকে একটু ডাকা যাক। এই পাহারাওয়ালা, ইদিকে আও।

[পুলিসের প্রবেশ]

দেখো, হামারা পাশের বাড়িমে দিনরাত ভর এইসা ক্যাঁচকঁ্যাচ করতা, নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হায়। ইস্‌কো কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা?

পুলিস। কেয়া বোলতা বাবু?

পণ্ডিত। আহা, এটা দেখি একেবারে নিরক্ষর মূর্খ! আরে, পাশের বাড়িমে একঠো গানের ওস্তাদ হায় নেই? উস্‌কো একদম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেহি হায়, দিনরাত ভর্ কেবল সারে গামা ভাঁজতা হায়।

পুলিস। কেয়া হোতা?

পণ্ডিত। আরে, খেলে যা! (সুর করিয়া) সারে গাগা মাপা ধানি ধানি—এইসা করতা হায়।

পুলিস। হাম কেয়া করেগা বাবু? উ হামারা কাম নেহি।

পণ্ডিত। না, তোমার কাজ না! মাইনে খাবে তুমি, আর কাজ করবে বেচারাম তেলি!

পুলিস। হাঁ বাবু।

পণ্ডিত। চেঁচাস কাহে? ফের পুজোর বকশিশ চায়গা তো এইসা উত্তম-মধ্যম দেগা, থোঁতামুখ ভোঁতা কর দেগা।

পুলিস। আরে, পাগলা হায় রে, পাগলা হায়!

[পুলিসের প্রস্থান]

পণ্ডিত। দেখ, ছোঁড়াটার আর সাড়াশব্দ নেই! ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যাঁ—

পণ্ডিত। অ্যাঁ কিরে বেয়াদব? আজ্ঞে বলতে পারিসনে? আধঘণ্টা ধরে অ্যাঁ করতে লেগেছে! বলি, পড়ছিস না কেন?

ঘটিরাম। হ্যাঁ, পড়ছিলাম তো।

পণ্ডিত। শুনতে পাই না কেন? চেঁচিয়ে পড়।

ঘটিরাম। (চিৎকার করিয়া)

অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—

পণ্ডিত। থাক্, থাক্, অতো চেঁচাসনে, একেবারে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে।

[কেষ্টার প্রবেশ]

কেষ্টা। লেখাপড়া করে যেই গাড়িচাপা পড়ে সেই। শুনলুম আজকে ও-পাড়ায় গানের মজলিস হবে।

পণ্ডিত। এতক্ষণে পড়তে এসেছিস?

কেষ্টা। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্'—সেই কখন এসেছি—এতক্ষণে কত পড়ে ফেললাম। 'আই গো আপ, ইউ গো ডাউন্'—

পণ্ডিত। যা, যা, আমি যেন আর দেখিনি, কাল আসিস্নি কেন?

কেষ্টা। কালকে কি করে আসব? ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত!

পণ্ডিত। ঝড় বৃষ্টি কিরে? কাল তো দিব্যি পরিষ্কার ছিল।

কেষ্টা। আজ্ঞে, শুক্কুরবারের আকাশ, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। কখন কি হয়ে পড়ে!

পণ্ডিত। বটে! তোর বাড়ি কতদূর?

কেষ্টা। আজ্ঞে, ঐ তালতলায়। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্।' 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্' মানে কি?

পণ্ডিত। 'আই'—'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'—গয়ে ওকার গো—গৌ গাবৌ গাবঃ, ইত্যমরঃ 'আপ্' কিনা আপঃ—সলিলং বারি অর্থাৎ জল। গরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে। কেন কাঁদিতেছে? না, 'উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা—'গো ডাউন', অর্থাৎ গুদামখানা। গুদামঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না, তাই না দেখে 'আই গো আপ্'—গরু কেবলি কান্দিতেছে—

ঘটিরাম। (বিকট হাস্য)

পণ্ডিত। ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যা—না, আজ্ঞে—

পণ্ডিত। ফের ওরকম বিটকেল শব্দ করবি তো পিটিয়ে সিধে করে দেব।

[পণ্ডিতের নিদ্রাচেষ্টা]

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই—

ঘটিরাম। ঘুমুচ্ছে? (ঠেলিয়া) ও পণ্ডিতমশাই! কেষ্টা ডাকছে, কেষ্টা ডাকছে—

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না।

পণ্ডিত। হুঁ, দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা। সব বলে দিতে হবে! তোদের কিছু হবে না! 'ওয়ান্‌স্‌ আই মেট্‌ এ লেম্‌ ম্যান্‌ ইন্‌ এ স্ট্রীট নিয়ার মাই হাউস্‌।' 'ওয়ান্‌স্‌ আই মেট্‌ এ লেম্‌ ম্যান্‌'—কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। 'ইন্‌ এ স্ট্রীট'—সে বিস্তর চেষ্টা করিল। 'নিয়ার মাই হাউস্‌'—কিন্তু সে হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইয়েটা বুঝতে পাল্‌লি না? (ঘটিরামের প্রতি) কিরে? পালাচ্ছিস যে!

ঘটিরাম। নাঃ, পালাচ্ছি না তো! কেষ্টা এমনি গোলমাল কচ্ছে কিচ্ছু আঁক কষতে পাচ্ছি না।

পণ্ডিত। কি আক দেখি নিয়ে আয়।

ঘটিরাম। আজ্ঞে এই যে! এই—চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে আধ মণ পটলের দাম কত?

পণ্ডিত। দেখি, চার সের আলু দশ আনা তো! তবে আধ মণ পটল—আহা, আবার পটল এল কোত্থেকে?

ঘটিরাম। তা তো জানি না। বোধ হয় পটলডাঙা থেকে।

পণ্ডিত। দূৎ! একি একটা আক হতে পারে? গাধা কোথাকার!

ঘটিরাম। তাই বলুন! আমি কত যোগ করলাম, ভাগ করলাম, শেষটায় জি-সি-এম্ পর্যন্ত করলাম, কিছুতেই হচ্ছিল না। বড্ড শক্ত, না?

পণ্ডিত। মেলা বকিস নে, যাঃ!

ঘটিরাম। যাবো? ছুটি?

কেষ্টা। ছুটি—ছুটি—ছুটি—

পণ্ডিত। না, না, ছুটি-টুটি হবে না।

ঘটিরাম। হ্যাঁ ভাই, তুই সাক্ষী আছিস, বলেছেন—যা!

কেষ্টা। হ্যাঁরে, আমাদের কিন্তু কোনো দোষ নেই।

[কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রস্থান]

পণ্ডিত। দেখলে কাণ্ডটা! এই সব হুজুকেই তো ছেলেগুলোকে মাটি কললে! আর জমিদারমশাইয়ের আক্কেলটা দেখ—এখানে এসে অবধি দশভূতে তাকে পেয়ে বসেছে—দেখ দেখি, টাকা ওড়াবার জন্য শেষটায় কিনা গানের মজলিস! ছ্যা ছ্যা!

[পণ্ডিতের প্রস্থান। জুড়ির প্রবেশ ও গান]

সাবধান হয়ে সবে অবধান কর রে।
ওহে শিষ্য গুণধর কোলাহল ছাড় রে॥

(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার।
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার ॥
(ওসে) বিক্রমে বিক্রমাদিত্য সর্বশাস্ত্রে ধুরন্ধর।
(আহা) সাক্ষাৎ যেন দাতাকর্ণ দানব্রতে ভয়ঙ্কর ॥
(এরা) খাচ্ছে দাচ্ছে ফূর্তি কচ্ছে নিত্য তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘণ্টা মারছে আড্ডা বখশিশাদি সন্ধানে ॥
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হললা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যের ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক ॥
(আহা) একজন বড্ড সাধাসিধে ভেদ করে না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা স্বার্থপর ॥
(ওরে) পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত বড্ড চণ্ডীবাবুর হিতার্থ।
(দেখ) অন্নলুচি ধ্বংস করি কচ্ছেন সবায় কৃতার্থ ॥
(আহা) বিদ্যে জাহির কচ্ছে সবাই পোলাও কোর্মা ভোজনে।
(দেখ) যত রাজ্যের নিষ্কর্মার দল বাড়ছে সবাই ওজনে ॥
(ওরে) অবিশ্রান্ত হুজুক নিত্য মুহূর্তেকো শান্তি নেই।
(আজ) পঞ্চবর্ষ অন্ত হৈল ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই ॥
(ওরে) কস্মিনকালে শুনি নাই রে এমন কাণ্ডকারখানা।
(ওই) খোসামুদে ভণ্ডগুলো আহ্লাদেতে আটখানা ॥
(আহা) পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হবে চণ্ডীবাবুর মস্তকে।
(দেখ) অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে চিত্রগুপ্তের পুস্তকে ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[জমিদার বাড়ি। তুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রবেশ]

তুলিরাম। এত কাণ্ডকারখানা করা গেল, এখন ভালো রকম দু-একটা ওস্তাদ আসে তবে মজলিসটা জমে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ। বেশ তালে আছি দাদা! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, খাওদাও আর ফুর্তি কর।

তুলিরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম ঘি-দুধ চর্বচোষ্য চলছে, আর কটা দিন যেতে দাও না—আর চেনবার যো থাকবে না!

[কেবলচাঁদের প্রবেশ]

কেবল। আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজলিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটুরাম ও তুলিরাম। (পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল। সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁটুরাম। কোনো জন্মে নামও শুনিনি—

তুলিরাম। চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না—

কেবল। হ্যাঁ, তা আপনারা গোপীকেষ্টবাবুকে চেনেন তো?

খেঁটুরাম। গোপীকেষ্ট?

তুলিরাম ও খেঁটুরাম। হ্যাঁ—নাম শুনেছি—বোধ হচ্ছে।

কেবল। আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়িওয়ালার খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিসতুতো ভাই।

তুলিরাম। তাই নাকি!

খেঁটুরাম। সে কথা বলতে হয়—আস:ত আজ্ঞা হোক মশাই।

ঢুলিরাম। বসতে আজ্ঞে হোক মশাই—

খেঁটুরাম। কি নামটা বললেন আপনার ?

কেবল। কেবলচাঁদ।

ঢুলিরাম। কি বললে ? বক্কেশ্বর ? তা বেশ, বকদাদা, আজ তোমার গান শোনা যাবে !

কেবল। তা বেশ, কি বলেন ? গানটা আরম্ভ করলে হয় না ?

খেঁটুরাম। না, না ! এখনই কি দরকার ? সবাই আসুক আগে—

কেবল। এই সুর-টুরগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

ঢুলিরাম। আরে মশাই ! আমাদের কাছে 'গা'-ও যা, 'ধা'-ও তাই—সবই সমান।

কেবল। হ্যাঁ—গানগুলোর কি মুশকিল জানেন ? ওগুলো আমার স্বরচিত কিনা—তাই, গাইতে একটু সংকোচ বোধ কচ্ছি।

খেঁটুরাম। তা নাই বা গাইলে—অন্য কিছু গাও না—

কেবল। আ মোলো যা ! এরা আমায় গাইতে দেবে না দেখছি, আমার ভালো-ভালো গানগুলো—

[কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রবেশ]

ঘটিরাম। আমরা গান শুনতে এলুম।

কেষ্টা। কই রে, লোকজন সব কই ? গাইবে কে ? আপনি বুঝি ?

কেবল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এরা যখন নেহাত পেড়াপীড়ি কচ্ছেন তখন না গাইলে সেটা ভয়ঙ্কর খারাপ দেখাবে।

[কেবলচাঁদ গুনগুন করিতে-করিতে সহসা সপ্তমে চিৎকার]

খেঁটুরাম। রক্ষে কর দাদা, এ অত্যাচার কেন ?

হুলিরাম। এটা 'ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব্' ইস্কুল নয়—আমাদের কানগুলো বেশ তাজা আছে।

কেবল। আজ্ঞে, সুরটো ঠিক আন্দাজ পাইনি—একটু চড়ে গিয়েছিল—না ?

হুলিরাম। একটু বলে একটু ?

খেঁটুরাম। রীতিমতো তেড়ে এসেছিল।

কেবল। আচ্ছা, একটু নামিয়ে ধরি—

[কেবলচাঁদের গান]

আহা, পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে ?
কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ
কোথা কর্ণ ভীমার্জুন
কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় বা সে মনু রে ?
মাটির সঙ্গে মিশছে সবি
কেঁচোর মতো খাচ্ছে খাবি।
কেবল আপিস খাটি কচ্ছে মাটি নধরপুষ্ট তনু রে—
ব্রাহ্মণের সে তেজ নেই
হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণের সে—

[কেবলচাঁদের মাথা চুলকানো]

হুলিরাম। শিঙ নেই আর লেজ নেই—

কেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ—

[কেবলচাঁদের গান]

ব্রাহ্মণের সে তেজ নেই
খাদ্যাখাদ্য ভেদ নেই
মনের দুঃখ বলি কারে মোরা কি হনু রে—
আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে।

খেঁটুরাম। দাঁড়ান একটু সামলে নি—অতো করুণ রস করবেন না।

[খেঁটু ও দুলি ক্রন্দনোন্মুখ। কেষ্ট ও ঘটিরামের উচ্চহাস্য]

খেঁটুরাম। তবে রে ছোকরা! তোরা হাসছিস কেন?

ঘটিরাম। বাঃ! হাসি পেলে হাসব না?

দুলিরাম। হাসি পাবে কেন? এখানে হাসবার কি হল?

খেঁটুরাম। ছ্যাবলামি পেয়েছিস? কথা নেই বার্তা নেই—হ্যাঃ-হ্যাঃ!

ঘটিরাম। কি কেষ্টা, হাসি পেলে হাসব না?

কেষ্টা। এই রে, পণ্ডিতমশাই আসছে—

ঘটিরাম ও কেষ্টা। এই রেঃ, এই রেঃ, এই রেঃ, পণ্ডিতমশাই আসছে—মাটিং চকার—তোর র‍্যাপারটা দে তো।

[ঘটিরাম ও কেষ্টার র‍্যাপার মুড়ি হইয়া উপবেশন। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। ভালো, ভালো! তোমরা মধ্যে-মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার না? নিত্যি-নিত্যি জমিদারমশাইকে বিরক্ত করাটা কি ভালো দেখায়?—ইকী! ক্যাবলটা এখানে এয়েছে কি করতে? (দুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রতি) আমোলো যা! তোমাদের যত ইয়ার-বকশী বুঝি জোটাচ্ছ একে-একে?

কেবল। দেখলেন মশায়? আমাকে অপমান কললে! আমাকে ইয়ার-বকশী বললে, অমন বললে কিন্তু আমি গাইব না।

পণ্ডিত। তা নাই বা গাইলে—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যা না গান। গানের ধমকে আমাদের পর্যন্ত পিলে চমকে ওঠে—তা, অন্যে পরে কা কথা!

[ছাতা ও বিশাল পুঁটলি লইয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। (ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রতি) আপনাদের কি হয়েছে? অমন করে বসে আছেন যে? কাশি? জ্বর? ন্যাড়া মাথা? ঠাণ্ডা লাগবে বলে?

পণ্ডিত। (ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রতি) কি হে, এখানে এসে হাজির হয়েছ? আচ্ছা বেরিয়ে নাও তারপর—

[রামকানাই কর্তৃক পণ্ডিতস্কন্ধে পুঁটলি স্থাপন]

তুমি কি রকম মানুষ হে?

রামকানাই। কেন? বেশ দিব্যি মানুষটি।

পণ্ডিত। বলি চোখ দিয়ে দেখতে পাও না কি?

রামকানাই। চোখ দিয়ে দেখতে পাই না তো কি কান দিয়ে দেখতে পাই?

পণ্ডিত। না হে, তুমি বড় বাচাল—শাস্ত্রে বলেছে—

রামকানাই। না—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি—

পণ্ডিত। আহা, বলি, তোমায় তো কেউ এখেনে ডাকেনি?

রামকানাই। ডাকবে আবার কি? এ কি নিলামের মাল পেয়েছে যে ডাকাডাকি করবে?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তবে অমন করে বসে থাকলে তো ভালো দেখায় না।

রামকানাই। ভালো দেখায় না কি হে ? তোমাকে যে অশ্বত্থ-গাছের মামদো ভূতের মতো দেখা যায়, সে বেলা কি ?

পণ্ডিত। আহা, বলি, যদি কিছু বলবার থাকে, তা চটপট বলে বাড়ি যাও না কেন ?

রামকানাই। হ্যাঁ, তাহলে তুমিও আমার পুঁটলিটা সরাবার সুবিধা পাও।

পণ্ডিত। কি আপদ ! বলি পুঁটলিটা রেখে যেতে বললে কে ? নিয়েই যাও না কেন ?

রামকানাই। মুটের পয়সা দেবে কে ?

পণ্ডিত। হাঁঃ—মুটের পয়সা দেবে কে ? মুটের পয়সা দেবে !

রামকানাই। উঃ ! দূৎ ! তোমার ময়লা চাদরটা আমার নাকের কাছে নেড়ো না।

[জমিদারের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। সর সর, জমিদারমশাই আসছেন।

ছুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর, সর।

জমিদার। কি রে ! রামা কখন এলি ? বেশ, বেশ, ভালো আছিস তো ?

রামকানাই। (প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে এই মাত্র আসছি—

পণ্ডিত। আপনার এই লোকটা ভারি উদ্ধতস্বভাব—কথা বলে যেন তেড়ে মারতে আসে।

জমিদার। ওরে রামা! বাবুদের কিছু বালিস-টালিস দে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

জমিদার। ও আমার বহুকেলে পুরোনো চাকর কিনা—কারুর কথা-টথা বড় শোনে-টোনে না। তবে লোকটা ভালো—দেশে গিছিল, আজ বহুকাল পরে এল।

খেঁটুরাম। ইনি হচ্ছেন কেবলচাঁদ ওস্তাদ—

ঢুলিরাম। মস্ত গাইয়ে।

খেঁটুরাম। আশ্চর্য! যত ওস্তাদ এসেছিল, ওঁর চেহারা দেখেই দে চম্পট।

ঢুলিরাম। তা হবে না? এঁরই গান শুনে আমাদের নবাব-সাহেব মুর্ছো গেছিলেন, এঁরই গান শোনবার জন্যে কিষণবাবু তেতাল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গেছিলেন—

খেঁটুরাম। এঁকে সভায় রাখতে কত রাজা-বাদশা জব্দ হল।

ঢুলিরাম। কত টাকাকড়ির শ্রাদ্ধ হল।

খেঁটুরাম। কত ওস্তাদ গাইয়ে জব্দ হল।

পণ্ডিত। ওহে, বেশি বাড়িয়ে কাজ কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অলমতিবিস্তারেন—বেশি বাড়াতে নেই।

খেঁটুরাম। আমি অনেক হাঙ্গামা করে তবে ওঁকে এনেছি।

ঢুলিরাম। তুই এনেছিস? দেখলেন মশাইরা, কাজ করব আমি, আর বাহাদুরি নেবেন উনি!

খেঁটুরাম। খবরদার!

ঢুলিরাম। চোপরও!

খেঁটুরাম। ফের !!

পণ্ডিত। সমাশ্বসীহি, সমাশ্বসীহি, জমিদারমশায়ের সামনে এমন গর্হিত আচরণ করতে নেই! আহা! সঙ্গীতশাস্ত্র-রসানভিজ্ঞ, সঙ্গীত আর ন্যায়শাস্ত্র বুঝলেন কিনা—অতি উপাদেয় জিনিস! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অভূত-তদ্ভাবে চ্বী সে এক অত্যদ্ভুদ্‌ ব্যাপার—

জমিদার। তাহলে গান আরম্ভ হোক। ওস্তাদজি আপনি মাঝে-মাঝে আমাদের গান-টান শোনাবেন—

কেবল। হ্যাঁ, তা, শোনাব বৈকি—অবিশ্যি এর দরুন আমার সব কাজকর্মের বড্ড ভয়ঙ্কর ক্ষেতি হবে, কিন্তু তা হোক—

পণ্ডিত। আরে ছো, ছো! তুমি তো ভারি ছোটলোক হে। এই সামান্য কাজটুকু করতেও তোমাদের যত রাজ্যের আপত্তি! আজ যদি জমিদারমশাই আদেশ করেন, এখেনে একটা টোল খুলতে হবে—আমার একশো কাজ থাক, হাজার কাজ থাক, আমি অমনি টোল খুলতে লেগে যাব। কেন? না, এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত যে ওঁর খাতিরে কিছু ত্যাগ স্বীকার করি, হোকগে ক্ষেতি, তাতে কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? রামা! যাও তো, এখুনি একটা লোক পাঠিয়ে আমার জিনিসগুলো ধাঁ করে আনিয়ে দাও তো—চণ্ডী জমিদারমশায়ের সম্মান রাখতেই হবে।

জমিদার। কিন্তু এখেনে যে জায়গার বড় অসুবিধে—

পণ্ডিত। কিছু না, কিছু না—ওর মধ্যেই সুবিধা করে নেব।

বুঝলেন চণ্ডীবাবু, আপনি আমাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না। রামা!

রামকানাই। আবার কেন?

পণ্ডিত। ওই বাইরের বড় ঘরটায় আমার বন্দোবস্ত করে দাও তো।

রামকানাই। সেখেনে দেখলুম ছুটি বাবু বসে আছেন।

ছুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার গাঁয়ের লোক। আপনার বাগানটা দেখলুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তাই ওদের বলে কয়ে এনেছি; ওরা এ-বিষয়ে একেবারে এক্‌স্‌পার্ট। মাইনের জন্য ভাববেন না—পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে।

পণ্ডিত। যা! বাবুদের হটিয়ে দে। বলগে ওখানে টোল বসবে।

ছুলিরাম। সিকী! আমার গাঁয়ের লোক! হবুগ্রামের অপমান!

পণ্ডিত। আরে না, না—রামা, দেখিস যেন বাবুদের ধমক-ধামক করিসনে—জমিদার মশায়ের যাতে অখ্যাতি না হয়—মিষ্টি করে বলবি। আর দেখ (গলা নামাইয়া) নেহাত যদি না শোনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দিস।

খেঁটুরাম। শোন্—ঘরটর দিয়ে কাজ নেই—জিনিসপত্রগুলো এনে উঠোনে ফেলে রাখিস—

পণ্ডিত। আর দেখ—ওই শব্দকল্পদ্রুমখানা আনতে ভুল হয় না যেন—আর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে—

ছুলিরাম। যেমন কথামালা ধারাপাত—

পণ্ডিত। সেগুলো হারায় না যেন—

কেবল। হ্যাঁ—সেই গানের কথাটা চাপা পড়ে গেল—

রামকানাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানটা হয়ে যাক—তারপর যাব এখন।

কেবল। এখানে বাজিয়ে কেউ নেই?

রামকানাই। আমি বাজাতে পারি—দাও তো পাখওয়াজটা —ধত্তেরে কেটে তাগ ঘড়ান্ ঘড়ান্ নাগে নাগে নাগে নাগে—নাগে দেৎ ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে—কই! গান আসছে না বুঝি?

পণ্ডিত। ইকী! চাকরটা এরকম করে কেন?

জমিদার। পুরোনো লোক কিনা! রামা তুই এখন চুপ-টুপ কর—বাবুদের বাধা-টাধা দিসনে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে!

[কেবলচাঁদের গান]

তানানা তাইরে নারে—তাইরে নারে—

তারে না তাইরে নাইরে—না-তানা-ন্না—

রামকানাই। এই যা! তাল কেটে গেল!

কেবল। আর কেন? থামো না বাপু!

রামকানাই। কেন মশাই? থামব কেন? নাগেদেৎ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে খেড়ে নাগ তেরে কেটে দেৎ—দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে—

পণ্ডিত। ওহে, জমিদারমশায়ের সামনে অমন করতে নেই—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—গত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ—বুঝলে কিনা।

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে-টাজে যা—পুরোনো মানুষ কিনা!

দুলিরাম। হ্যাঁ, ওস্তাদজি—ওই যে গাইলেন ওটা কি তাল বলছিলেন?

কেবল। ওটা—ওটা হচ্ছে মাদ্রাজী একতালা।

খেঁটুরাম। সবে একতালা? আহা, যখন চৌতালায় উঠবে—তখন না জানি কেমন হবে!

রামকানাই। তখন সব কানে তালা লেগে যাবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ ওস্তাদজি, তাহলে আপনার গানটা শিগগির শেষ করে ফেলুন—আহা, অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত!

রামকানাই। ভারি উচ্চাঙ্গ! সেই আমাদের একজন যা ইমনকল্যাণের আলাপ করেছিল—সেটা পুরোপুরি শিখতে পারিনি। যেটুকু শিখেছি শুনবেন? আ—আ—আ—কেউ কেউ কেউ।

জমিদার। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

[রামকানাইয়ের দ্বার পর্যন্ত প্রস্থান। কেবলচাঁদের গান]

হায় রে সোনার ভারত—

ঘটিরাম। হাসিয়ে দিলি যে?

কেষ্টা। হাসিয়ে দিচ্ছিস কেন রে?

ঘটিরাম। তুই তো আগে হাসছিলি—

কেষ্টা। যাঃ! আমি কখন হাসলাম—

কেবল। দেখলেন মশাই! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কী কাণ্ডটা কললে!

খেঁটুরাম। রামা! একে সটাং রাস্তা পার করে দিয়ে আয় তো—

রামকানাই। (কেবলকে ধরিয়া) একে?

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান]

কেবল। এইও, ইস্‌টুপিট বেয়াদোব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস!

পণ্ডিত। ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক!

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা দেখি—তুই আমার নাম-টাম ডোবাবি দেখছি।

[রামকানাইয়ের প্রস্থান। কেবলচাঁদের আবার গান আরম্ভ]

হায়রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্থ হইল
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধূলায় পতিত রইল
যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত সব ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান
আজকাল তাকেই কিনা—সব অবজ্ঞা করিতেছে—
এবং দেখাচ্ছে সবাই মর্তমান
কোথা সেই তিরিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ
সাড়ে চোদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান
সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে
সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো
দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!

হুলিরাম। এই ! সিডিশাস্!

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কি বললে ? রাজদ্রোহসূচক ? অ্যাঁ ?

খেঁটুরাম। তবে রে! সিডিশাস্ গান কচ্ছিস কেন রে ?

হুলিরাম। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেণ্টের চাকরি করে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁরে,ওর মামাতোভাইয়ের চাকরি ঘোচাবি কেন রে ?

কেবল। আমি তো জানতুমনে—আমি জানতুমনে—

পণ্ডিত। জানতিনে কিরে ? কেন জানতিনে ?

[পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে প্রহার]

কেবল। কী ! মারলি কেন রে ? ফের মার দেখি !

[পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে পুনঃপ্রহার]

এবার মারবি তো একেবারে—

[পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে পুনঃপ্রহার]

উঃ ! এত জোরে মারলি কেনরে ইস্টুপিট! দাঁড়া দেখাচ্ছি—

[কেবলচাঁদের পলায়ন]

পণ্ডিত। যা না গাইলেন ! গলা শুনলে ছত্রিশ রাগিণী ছুটে পালায়।

হুলিরাম। ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের 'গ'টা মেলে কিনা সন্দেহ !

পণ্ডিত। তোমরা কোত্থেকে এ সব আপদ জোটাও হে ? জমিদারমশায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে কি তোমাদের একটুও দৃষ্টি নেই ?

খেঁটুরাম। এই হুলিরামটাই তো যত নষ্টের গোড়া, যত রাজ্যের অঘামারা রোথো লোক ডেকে আনবে!

হুলিরাম। বিলক্ষণ। আমি ডেকে আনলাম? আমার সাতজন্মে ওর সঙ্গে আলাপ নেই।

খেঁটুরাম। এত করে বারণ কল্লুম, তবু ডেকে আনলে!

হুলিরাম। না, মশাই! ও নিজে ডেকে এনেছে আমি আদবে কিছু জানিনে!

পণ্ডিত। জানো না তো জানো না—তা অত গরম হবার দরকার কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উষ্ণত্বমগ্ন্যা-তপসংপ্রয়োগাৎ—

জমিদার। এবারে গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দিখি—

খেঁটুরাম। আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা! উঃ!

হুলিরাম। আমাদের বেড়ালটা সর্দি-গর্মি হয়ে মারা গেছে—

জমিদার। এ সব বোধহয় সেই ধূমকেতু-ফেতুর জন্যে—

পণ্ডিত। হ্যাঁ, সিদিন আমাদের ওখানে ধূমকেতুর ন্যাজ দেখা গিছিল—

হুলিরাম। কার ন্যাজ কে জানে?

খেঁটুরাম। ওঁরই ন্যাজ হয়তো।

জমিদার। ধূমকেতুটা এসে কি কাণ্ড-টাণ্ডই করল? ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প—

খেঁটুরাম। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি—

হুলিরাম। পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশান!

পণ্ডিত। আমি শুনেছি ওই পানের পোকার খবরটা নাকি সত্যি নয়!

খেঁটুরাম। আলবৎ সত্যি! নন্দলাল ডাক্তার সচক্ষে দেখেছে লোকে পান খাচ্ছে আর মচ্ছে!

জমিদার। ঈস্! বল কি হে? তাহলে তো কথাটা সত্যি বলতে হবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ—দূরবীণ দিয়ে সে পোকা দেখা গেছে—

খেঁটুরাম। কলকেতার সায়েব ডাক্তার বলেছে তার ভয়ঙ্কর তেজাল বিষ।

ঢুলিরাম। হ্যাঁ—আমি দেখিছি, শাদা মতন আবার ন্যাজ আছে। কার ন্যাজ কে জানে?

[রামকানাইয়ের দ্রুত প্রবেশ]

রামকানাই। এইরে সেই দাড়িওয়ালা! সেই দাড়িওয়ালা বাবুটা আমায় তেড়ে এসেছিল! উঃ!

সকলে। কি হয়েছে! কি হয়েছে!

রামকানাই। সেই বাইরের ঘরের বাবুরা—উঃ—আমায় বেদম মারপিট করেছে। একজন ছাগলদাড়ি বাবু আছে, সে আমায় দেখেই হঠাৎ ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে এসেছিল—উঃ!

পণ্ডিত। সিকী রে! তুই করেছিলি কি?

রামকানাই। আমি তো কিচ্ছু করিনি—আমি বললাম,

এখেনে ঢোল বসবে, বাবুরা যদি একটু অন্যত্তর যান, নেহাত যদি না যান, আপনাদের ঘাড়ে ধাক্কা দেওয়া হবে।

তুলিরাম। কী! ভদ্রলোককে এমনি করে ইনসাল্ট্!

খেঁটুরাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

রামকানাই। আমি তো মিষ্টি করে বলেছিলুম—

খেঁটুরাম। ব্যাটা, তোমায় মিষ্টি জুতো না দিলে তুমি সিধে হবে না—

পণ্ডিত। আমার জিনিসপত্রগুলো কি কল্লি?

রামকানাই। ওই যে, বাইরের উঠোনে ফেলে রেখেছি!

পণ্ডিত। দেখলেন মশাই, কাণ্ডটা দেখলেন?

রামকানাই। ওই বাবুটি যে বললেন!

পণ্ডিত। যা, যা, যেখানে হয় শিগগির বন্দোবস্ত করে দে! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে এক জায়গায় এমনি লিখেছে—

রামকানাই। বলি ন্যায়শাস্ত্র শুনলে তো আর পেট ভরবে না! তোমরা কি এইখেনে বসেই রাত কাবার করবে নাকি? জমিদারমশায়ের কি খাওয়া-দাওয়া নেই?

জমিদার। ওরে রামা, অমন করে বলতে নেই—বাবুদের মান্য করে কথা-টথা বলিস—আর পণ্ডিতমশাইকে কি চোখ রাঙায়? .

রামকানাই। যে আজ্ঞে, প্রাতঃ প্রণাম পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত। রামা, নেতাইবাবুদের বাড়ি আমার দুই পোড়ো থাকে, তাদের খবর দিস তো।

[পণ্ডিত, খেঁটুরাম ও ঢুলিরামের প্রস্থান]

জমিদার। রামা, দেখছিস তো কাণ্ডটা?

রামকানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ—

জমিদার। উৎপাত যে বেড়ে চলল—কি করা যায়?

রামকানাই। আজ্ঞে, হুকুম পেলেই সব সাফ করে দি।

জমিদার। না, না, ওরা আপনা থেকে উঠে যায়, এমন কিছু করা-টরা যায় না? অথচ আমার নিন্দেটা না হয়!

রামকানাই। তাহলে ওদের ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া দিলে হয় না?

জমিদার। দুৎ! এটাকে কিছু জিগগেস করাই ঝকমারি! যা, তুই এক কাজ কর—আমার মামার বাড়ি যা। সেখান থেকে কেদারমামাকে ডেকে আনবি—তাকে সব বলে কয়ে আনিস!

রামকানাই। যে আজ্ঞে—

জমিদার। মামা এলেই সব সিধে করে দেবে—উকিলে বুদ্ধি কিনা!

[গান]

নাছোড়বান্দা নড়েন না!
উড়ে আসেন, জুড়ে বসেন,
মাথায় কেন চড়েন না!
নাছোড়বান্দা নড়েন না!
যাবার নামটি করেন না,
ধাক্কা দিলে সরেন না!

নাছোড়বান্দা নড়েন না!
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই!
চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গালি,
হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই!
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই
আসছে যে-কেউ পাচ্ছে ঠাঁই,
ইকীরকম হচ্ছে ভাই?
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই!

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[জমিদার বাড়ি। কেদারকৃষ্ণ, জমিদার ও রামকানাই]

কেদার। ডোন্ট্ পরওয়ার ভাগ্নে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বড় জোর দুটো দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। রামা!

রামকানাই। আজ্ঞে—

কেদার। তুই মেলা বুদ্ধি খরচ করিসনে—যা বলব তাই করে যাবি। আগে আমার বইগুলো আর খাতা পেনসিলটে বার করে রাখ।

[রামকানাইয়ের প্রস্থান]

ভাগ্নে, তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে, আমি সব সাবাড় করে দিচ্ছি—কিছু গোল-টোল বাধলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও—আমায় গাল দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দিও।

[উভয়ের প্রস্থান। পণ্ডিত ও ঢুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই বড় আপসোস কচ্ছিলেন—বলছিলেন, এই খেঁটুরামের উৎপাতে তাঁর আর সোয়াস্তি নেই—ওকে যত শিগগির পার অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—বুঝলে কিনা।

ঢুলিরাম। হ্যাঁ, এ আর একটা মুশকিল কি? এক্ষুনি ঘাড়ে ধরে—

[খেঁটুরামের প্রবেশ]

দাঁড়ান গাঁয়ের লোক ঢুটোকে ডেকে আনি।

[ঢুলিরামের প্রস্থান]

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই যা চটেছেন ঢুলিরামের ওপর—কী বলব! দেখ, শেষটায় ওর জন্যেই তোমাদের সকলের অন্ন মারা যাবে। ওকে যদি তাড়াতে পার, আঃ —জমিদারমশাই যা খুশি হবেন!

খেঁটুরাম। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সব ব্যাটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছি, (স্বগত) তোমাকে সুদ্ধু।

পণ্ডিত। আর তোমার নিন্দেটা যা করে, কী বলব—এইমাত্র তোমার নামে যা নয় তা বলে গেল।

[ঢুলিরামের প্রবেশ]

রামা! ওরে রামারে! ঝট করে ঢুটো পান দিয়ে যা তো—রামাটা গেল কোথায়? ওহে, রামাকে একটু

ডেকে দাও তো।

খেঁটুরাম। না রে, ডাকিসনে।

ঘুলিরাম। রামা!—হয়তো বাড়ি নেই।

খেঁটুরাম। রামাটা ভারি দুষ্টু! এতক্ষণ হয়তো ছিল, যেই আপনি ডেকেছেন, অমনি হয়তো পালিয়েছে।

ঘুলিরাম। হয়তো অসুখ-টসুখ করেছে।

পণ্ডিত। তোমরা হয়তো-হয়তো করেই সব সারলে দেখছি! রামারে!

[রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামা, জমিদারমশাই নিচে নামলে একটু খবর দিস তো, আমার একটু নিরিবিলি কথা আছে।

খেঁটুরাম। আমোলো যা! আমারও নিরিবিলি কথা আছে।

ঘুলিরাম। আমারও আছে—

রামকানাই। তোমরা বসে-বসে ভেরেণ্ডা ভাজো, তিনি আজ নিচে নামছেন না—তাঁর মামা এসেছেন যে! তাঁকে কিন্তু তোমরা চটিও না, ভারি বদমেজাজ আর রগচটা—এই যে তিনি আসছেন—আসুন, আসুন—ইনিই কেদারকেষ্টবাবু, জমিদারমশায়ের মামা!

[সকলের অভিবাদন]

পণ্ডিত। আসুন, আসুন—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আপনার ভাগ্নেটি—আহা! অতি চমৎকার লোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—

হুলিরাম। নাঃ! আবার ন্যায়শাস্ত্র শুরু করলে।

খেঁটুরাম। চল আমরা একটু ঘুরে আসিগে।

[হুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রস্থান]

কেদার। এই লোক দুটোর চেহারা বড় সুবিধের নয়—

পণ্ডিত। তা সুবিধের হবে কোত্থেকে—হাজার হোক ছোট-লোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। আপনার ভাগ্নে তো কাউকে কিছু বলেন না—তাই ওরা আসকারা পেয়ে গেছে। এমনি বেয়াদবী করে—কী বলব!

কেদার। বটে! তা আপনারা প্রতিকার করেন না কেন?

পণ্ডিত। কি করি বলুন? আপনারা থাকতে আমার তো কিছু বলা উচিত হয় না।

কেদার। এক কাজ করুন, এর পর যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, ঘাড়টি ধরে বার করে দেবেন।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো করা উচিত। আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রে বলেছে—যা শত্রু পরে পরে।

কেদার। আপনার সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে—কী পাণ্ডিত্য! আবার কি মিষ্ট স্বভাব! আমার এই ক'টা লেখা আছে, এগুলো আপনাকে একটু শোনাই—এমন সমজদার লোক তো আর সচরাচর জোটে না!

[কেদারকৃষ্ণের পাঠ]

অমানিশার গভীর তমসাজাল ভেদ করিয়া ঐ পূর্বদিকে তরুণ

তপন ধীরে-ধীরে উঁকি মারছে। বিহঙ্গের কলকল্লোলে, শিশির-সিক্ত বায়ুর হিল্লোলে দিগদিগন্ত আমোদিত মুখরিত উচ্ছ্বসিত হইয়া, আহা, স্বভাবের সেই শোভা চমৎকার হয়েছে! হে নিদ্রিত মানব সকল! ঐ শুনো বাছুরগুলি ল্যাজ তুলিয়া ছুটিতেছে, হাম্বা-হাম্বা রবে তোমরা উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত। আহা, কবিরা তো সত্যই বলিয়াছেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল—'

পণ্ডিত। চমৎকার হয়েছে! আমার একটু কাজ আছে—এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার। দাঁড়ান, এই জায়গাটা ভারি ইণ্টারেস্টিং :

[কেদারকৃষ্ণের পুনরায় পাঠ]

দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, বিকাল নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই,—কেবল সেই এক চিন্তা, সেই এক কল্পনা, এক জল্পনা, এক তন্ত্র, এক মন্ত্র।—কেমন?—সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য-নবোৎসাহে—কেমন? ভাষার কেমন একটা সহজ ভঙ্গী আছে সেটা লক্ষ্য করেছেন?—সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভি-মুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য নবোৎসাহে সেই একই সুর, সেই একই ছন্দ, সেই একই সঙ্গীতকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্ষান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই—

পণ্ডিত। দাঁড়ান, আমার বড় তাড়াতাড়ি—ধাঁ করে এক্ষুনি আসব।

[পণ্ডিতের প্রস্থান]

কেদার। হ্যাঁ, একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি—আচ্ছা, আবার ঘুরে আসুক—হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ব।

[কেদারকৃষ্ণের প্রস্থান। নেপথ্যে খেঁটুরাম ও ডুলিরামের কণ্ঠস্বর]

খেঁটুরাম। দেখ, চোরের দশদিন আর সাধুর একদিন।

ডুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই তো সবই করবি, যা! যা!

[খেঁটুরাম ও ডুলিরামের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। দেখ, মেলা চালাকি করিসনে, কিছু বলিনে বলে?

ডুলিরাম। একদিন ধরে এইসা পিটুনি দেব—

খেঁটুরাম। দেখ এসব আমি পছন্দ করি না কিন্তু—

ডুলিরাম। দাঁড়া,আমার গাঁয়ের লোক ডুটোকে ডেকে আনছি—

[পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। (ডুলির প্রতি) ওহে, হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বল, ঘা দু-চার লাগিয়ে দাও না—

[খেঁটুরাম ও ডুলিরামের লড়াই—পণ্ডিতের বাধা প্রদান]

অ্যা! মারামারি কচ্ছ? এক্ষুনি ঘাড় ধরে বিদায় করে দেব।

খেঁটুরাম। কী! উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, আবার কথার ভঙ্গী দেখ।

ডুলিরাম। ঘাড় ধরবে? আমারগাঁয়েরলোকডুটো গেলকোথায়?

পণ্ডিত। তোমাকে বলিনি তো! তোমাকে বলিনি!

খেঁটুরাম। তবে আমাকে বলেছ?

[খেঁটুরামের পণ্ডিতকে প্রহার]

পণ্ডিত। ইকী! উঃ! ওরে রামা! রামারে! শিগগির ছুটে আয়, ওহে, উঃ! দেখ, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উঃ!

[কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। তোমরা কী আরম্ভ করেছ বল দেখি? দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

খেঁটুরাম। কি আরম্ভ করেছিস বল্ দেখি?

ঢুলিরাম। দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

পণ্ডিত। আমাকে মারতে-মারতে একেবারে কালশিরে পড়িয়ে দিয়েছে।

কেদার। দেখ, আমার ভাগ্নে ভালোমানুষ, এসব সইতে পারে—কিন্তু আমার সহ্য হয় না। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

[রামকানাইয়ের খেঁটুরাম ও ঢুলিরামকে গলহস্ত]

ঢুলিরাম। কী ভদ্দোরলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!

খেঁটুরাম। চাকর দিয়ে ইন্‌সাল্ট্!

ঢুলিরাম। কী! এত বড় কথা! এক্ষুনি আমি রাগ করে বাড়ি চলে যাব। তোকে অপমান করেছে—কক্ষনো এখানে থাকিস না—আচ্ছা থাক, এবার মাপ করা গেল। আর একবার করলে টের পাইয়ে দেব। আমার গাঁয়ের লোক ঢুটোকে খবর দিচ্ছি।

[খেঁটুরাম ও ঢুলিরামের গম্ভীর ভাবে প্রস্থান, রামকানাইয়েরও প্রস্থান]

পণ্ডিত। দেখলেন তো! এর ওপর তো আর ওষুধ চলে না!

কেদার। হ্যাঁ—তা আসুন—একটু কাব্যালাপ করা যাক।

পণ্ডিত। এই মাটি করেছে—আচ্ছা—আজ রাত্রে বেশ করে শোনা যাবে।

কেদার। না, রাত্রে তো সুবিধে হবে না—আমার চোখ খারাপ কিনা! শুনুন—ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স খুব কম ছিল—সাত বছর কি আট বছর হবে, কি বড় জোর নয় কি দশ কি এগারো। সেই সময় আমি একটি বই পড়েছিলাম —আর, সে একখানা বইয়ের মতন বই বটে! এখনো যখন তার কথা মাঝে-মাঝে স্মৃতিপথে উদিত হয়, মন যেন উৎসাহে আপ্লুত হয়ে যায়। শুনুন—চমৎকার বই, বোধোদয়—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—মানুষ, পশুর ন্যায় চারি পায়ে চলে না, দুই—

পণ্ডিত। ও আমি পাঁচশোবার পড়েছি।

কেদার। পড়েছেন? কেমন! স্বীকার করুন, ভালো বই নয়? শুনুন—

[কেদারকৃষ্ণের বোধোদয় পাঠ]

পণ্ডিত। ঘ্যান-ঘ্যান করে মাথা ধরিয়ে দিলে—

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রবেশ]

ঘটিরাম। মাথা ধরেছে? অ্যাঁ?

কেষ্টা। আজ বুঝি আমাদের ছুটি? অ্যাঁ?

[পণ্ডিত কর্তৃক উভয়কে চপেটাঘাত]

পণ্ডিত। যা! এখন ত্যক্ত করিসনে—

কেষ্টা। কিরে, তোকে মারল নাকি ?

ঘটিরাম। দূৎ! আমাকে মারবে কেন ? তোকে তো মারল।

কেষ্টা। হ্যাঁঃ! নিজে মার খেয়ে এখন—

ঘটিরাম। আমি দেখলুম তোকে মারল—

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান]

কেদার। হ্যাঁ, তারপর শুনুন—

পণ্ডিত। এ তো আচ্ছা বেল্লিকের হাতে পড়া গেল! ইকী মশায়! বলছি শুনব না—কেন খামখা বিরক্ত কচ্ছেন ?

কেদার। আহা! এইটে শুনে নিন—আমি ছেলেবেলায় একটা পোয়েট্রি লিখেছিলাম—তখন বয়েস অল্প। কিন্তু সে হিসেবে লেখাটা কেমন দেখুন—

[কেদারকৃষ্ণের কবিতা পাঠ]

একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেন কালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ভয় পেয়ে সকলে তো থরহরি কম্পমান
চিৎকারিল কেহ সুকরুণ আর্তরবে অথবা যেমতি
লট্‌খটে গরুর গাড়ি চলিবার কালে
প্রকাশে দারিদ্র্য নিজ বিচিত্র বিলাপে—
কেহ জপে রাম নাম—আমি হয়ে ক্রুদ্ধ
ডাকিলাম ভৃত্যকে—'ওরে, ধেয়ে যাও দ্রুত
রাস্তার দরজাটা করে দাও বন্ধ—
আর নিয়ে এস ঝট করে তিনতলা হতে

আমার সে দু-নলা বন্দুক'—এইরূপে
বাখানিল সবে মোর উপস্থিত বুদ্ধি
কহিল সকলে, 'আজি মারিতাম নির্ঘাত
যদি না থাকিত ব্যাঘ্র পিঞ্জরের মধ্যে—'

পণ্ডিত। হাড় জ্বালালে দেখছি—

কেদার। (স্বগত) বকে-বকে গলা শুকিয়ে গেল—এখন রামাকে লেলিয়ে দি গিয়ে —

[কেদারকৃষ্ণের প্রস্থান। খেঁটুরাম ও ঢুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত। যাও, যাও, এখন আমায় ঘাঁটিও না, আমার মেজাজ ভালো নেই!

খেঁটুরাম। ওরে বাসরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই!

ঢুলিরাম। ঘাঁটাস-টাঁটাসনে—শেষটায় ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবি।

[রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। ওয়াক্—থুঃ—থু—থু—থু—ওয়াক্—

খেঁটুরাম। ইকীরে? ওরকম কচ্ছিস কেন?

রামকানাই। অ্যাঃ—থু—থু—কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলেছি।

ঢুলিরাম। কেরোসিন তেল খেয়েছিস?

খেঁটুরাম। সিকী! কেরোসিন খেতে গেলি কেন রে?

রামকানাই। শখ করে কি আর কেউ কেরোসিন খায়? গায়ে লেখা ছিল—লেমন্ সিরাপ!

হুলিরাম। এখন একটা দেশলাইয়ের কাটি খেয়ে ফেল্—
তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

রামকানাই। কি পণ্ডিতমশায়, আপনার ন্যায়শাস্ত্রে আর
কিছু বলে-টলেনি?

খেঁটুরাম। (মশা মারিতে-মারিতে) আর দাদা ন্যায়শাস্ত্র-টাস্ত্র
ভালো লাগে না—বলি আজকাল মশাটা কেমন বল দেখি?

রামকানাই। বরাবর যেমন থাকে, ছোট-ছোট কালো
মতন, উড়ে বেড়ায়—

খেঁটুরাম। আহা, বলি লাগে কেমন?

রামকানাই। তা কি করে বলব? কখনো ভাজাও করিনি,
চচ্চড়িও খাইনি।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ, বলি অত্যেচারটা দেখছ তো?

রামকানাই। অত্যেচার আবার কি! চুরিও করে না,
ডাকাতিও করে না, পরের বাড়িতে আড্ডাও মারে না—

পণ্ডিত। ওহে দেখ, তোমাদের ওসব ইয়ার্কি মারতে হয়
বাইরে গিয়ে কর—আমার কাছে নয়! রামা! আমার
ব্যাকরণটা গেল কোথায়—

রামকানাই। ট্যাক্রম্?

পণ্ডিত। তবেরে, শত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ, আমার সঙ্গে রসিকতা?

রামকানাই। আবার রসিকতা কি কললুম?

পণ্ডিত। বলি, বইখানা কি কাগে নিল, না উড়ে গেল বাতাসে?

রামকানাই। বাতাসা?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাতাসা খাওয়াচ্ছি—এইরকম করে তোরা জিনিসপত্র লোকসান করবি? ব্যাটা হতভাগা জোচ্চোর—

[পণ্ডিতের রামকানাইকে প্রহার। দুলিরাম ও খেঁটুরামের পলায়ন]

রামকানাই। মেরে ফেললেরে! উঃ—ইকী মশাই! দাঁড়াও আমি মামাবাবুকে ডাকছি, আর পুলিসে খবর দিচ্ছি।

পণ্ডিত। ওহে শোনো-শোনো—আমি কিন্তু সে রকম ভাবে মারিনি।

রামকানাই। মেরেছ তার আবার রকম বেরকম কি হে? পুলিস! পুলিস! উঃ!

[রামার পতন। কেদারের প্রবেশ। পণ্ডিতের পলায়ন]

কেদার। কিরে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় কললি যে! ব্যাপারটা কি?

রামকানাই। আমায় মেরেছে! উঃ—আমায় মেরেছে—উঃ! কান দুটো ভোঁ-ভোঁ কচ্ছে—মাথা ঘুচ্ছে!

কেদার। মেরেছে! বাঃ! এই তো চাই। দাঁড়া এইসা চাল চালব, একেবারে বাজি মাত। তুই এক কাজ কর, সেই দাড়িটা আর লাল পাগড়িটা ঠিক করে রাখ। আর ঐ উঠোনটায় বসে বসে আর্তনাদ করতে থাক, যখন 'কোন্ হ্যায় রে' বলে ডাক দেব অমনি এসে হাজির হবি—একেবারে রামসিং দারোগা, বুঝলি তো? তুই খালি চেহারাটা দেখিয়ে যাবি—বোল-চাল সব আমি দেব। বাঃ আপনা থেকে দিব্যি কাজ এগিয়ে গেল, তারপর ও দুটোকে সরাতে কতক্ষণ?

[রামকানাইয়ের প্রস্থান। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। রামার কী হয়েছে? বেশি কিছু হয়নি তো?

কেদার। না, না, বেশি কিছু হয়নি। খান চার-পাঁচ পাঁজর ভেঙে গেছে আর ডিজেস্‌চান অফ দি লান্‌গ্‌স সাংঘাতিক! তা আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। ও ব্যাটা আবার পুলিসে খবর না দেয়! সেবারে একটা এরকম কেস হয়েছিল— পুলিসে টের পেয়ে—পাঁচ বছরের মতো চালান করে দিয়েছিল।

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! পাঁচ বছর!!

কেদার। আপনি ব্যস্ত হবেন না! উঃ—সেবারে একটা লোক মারামারি করেছিল, তাকে দিয়েছিল ঘানি ঠেলতে। বলব কী মশাই, দেড় মাসে অর্ধেক রোগা!

পণ্ডিত। অ্যাঁ—অ্যাঁ একেবারে অর্ধেক রোগা!

কেদার। তা আপনি বেশি ভাববেন না—ওই পুলিস ব্যাটারা কোনো রকমে টের না পেলেই হল—কিন্তু আজকাল যে রকম গোয়েন্দা টিকটিকির আমদানি হয়েছে—কোনো কথা লুকোবার যো নেই—আপনি কবার হাই তুললেন, তুড়ি দিলেন—সব খাতায় লেখা! সেবার এক ব্যাটা বামুন মারামারি করে লুকিয়েছিল। লুকোলে হবে কি? পুলিসে টের পেয়ে ধরে এনে পঁচিশ দফা জুতো!

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! বামুন! জুতো!!

কেদার। বাইরে কে? কোন হ্যায় রে? তা আপনি বেশি

ব্যস্ত হবেন না! আমি থাকতে ভয় কি? কি রকম ভাবে মেরেছিলেন বলুন তো?

পণ্ডিত। খুব আস্তে পিঠের এইখেনে—

কেদার। পিঠে! এইখেনে! সর্বনাশ! ৭৯৪ ধারা! এর উপর তো আমার হাতনেই—তা আপনি বেশি চিন্তিত হবেন না। আমি দারোগাবাবুকে বলে-কয়ে আপনার মেয়াদ কমিয়ে দেব।

[শশব্যস্তে খেঁটুরাম ও ছুলিরামের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। এক ব্যাটা পুলিস ইদিকে আসছে।

ছুলিরাম। আমায় দেখে রুল উঁচিয়ে আসছিল। আপনার বাক্সের মধ্যে একটা সোনার চেন ছিল—আমি কিন্তু সেটা চুরি করিনি।

খেঁটুরাম। চুরি হবে কোত্থেকে—যেখানে যা থাকে আমরা সব যত্ন করে তুলে রাখি।

[খেঁটুরাম ট্যাঁক দেখাইল। পুলিসের বেশে রামকানাইয়ের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। এইরে! এইরে!

ছুলিরাম। এই যে সিদিন নিতাইবাবুর একটা ঘড়ি চুরি হয়েছিল আমি কিন্তু তার কিছুই জানি না!

খেঁটুরাম। আর, সেদিন যে চৌরাস্তার মোড়ে একটা লোক বেদম ঠেঙা খেয়েছিল—আমি কিন্তু তার গায়ে হাতও দিইনি।

ছুলিরাম। আমার পুঁটলির মধ্যে সোনার চেন, নক্সা কাটা রুপোর ঘড়ি, দুটো আংটি এসব কিছু নেই।

পণ্ডিত। হাম্ পুজোর সময় তোমকো বহুত মিষ্টান্ন আউর পুলিপিঠে খাওয়ায়গা।

কেদার। দারোগাবাবু আতা হ্যায় ?

পুলিস। হ্যাঁ বাবু—

কেদার। হাত কাড়া লেকার ?

পুলিস। হ্যাঁ বাবু—

কেদার। বাড়ি সারচ্ হোগা ?

পুলিস। হ্যাঁ বাবু—

কেদার। সব মাটি কললে—আচ্ছা, আমিও ব্যাটাকে একটু ফাঁক তাল্‌লায় সরিয়ে নিচ্ছি, আপনি এই সুযোগে সরে পড়ুন, আর এ-মুখো হবেন না—বছর দুই বাড়ি থেকে বেরোবেন না! তোমরা পালিও না কিন্তু। (পুলিসের প্রতি) আচ্ছা চল—

[কেদারকৃষ্ণ ও পুলিসের প্রস্থান]

পণ্ডিত। আর থামাথামি নেই—একেবারে সেই বস্তি পাড়ায় মামার বাড়ি গিয়ে উঠব—ওরে ঘটে, ওরে কেষ্টা, দৌড়ে আয়—ও ঘর থেকে আমার বিছানাটা আর শব্দকল্পদ্রুম-খানা নিয়ে আয় তো। শিগগির বাড়ি চল।

[পণ্ডিতের প্রস্থান]

ছুলিরাম। আর কেন দাদা? পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে সরে পড়া যাক না!

খেঁটুরাম। হ্যাঁ—পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি দাদা?

ঢুলিরাম। জমিদার ব্যাটার কাণ্ডটা দেখ—আমাদের কি নাস্তানাবুদটাই করলে—চাকর দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা তার ওপরে পুলিস!

খেঁটুরাম। আমরা বেচারারা যে দুটি করে খাচ্ছিলাম, সে আর তার সহ্য হল না।

ঢুলিরাম। ছোটলোক! ছোটলোক! ওরে, গল্প আক্কেল-গুড়ুমটা উঠিয়ে নে! যথা লাভ!

[খেঁটুরাম ও ঢুলিরামের প্রস্থান। কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

কেদার। দেখলি তো রামা! একেই বলে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—মানুষ চেনা চাই। ঠিক লক্ষণ দেখে ওষুধ দিতে হয়—

রামকানাই। আজ্ঞে—ঝড়ে কাক মরে আর ফকিরের কেরামত বাড়ে—

[উভয়ের প্রস্থান। সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ির প্রবেশ ও গান]

ওরে ও চণ্ডীচরণ!
তোমার কি নাইরে মরণ।
কোন সাহসে চাকর ডেকে
ভদ্রলোকের কান মলাও।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

পাত্রগণ

রাম	সুগ্রীব
জাম্বুবান	হনুমান
সভাসদগণ	বানরগণ
বিভীষণ	রাবণ
লক্ষ্মণ	যমদূতদ্বয়
দূত	যম

॥ প্রথম দৃশ্য। রামের শিবির ॥

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে-চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যিই-সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে। হয় না, হবে না—হতে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, যা, ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়। হনুমান এসে বললে কি, ফেলবারও দরকার হল না—সে একেবারে মরে গেছে।

সকলে। বাঃ বাঃ!—একদম মরে গেছে—ব্যস! আর চাই কি, খুব ফুর্তি করা!

[বাইরে গোলমাল]

ঐ দেখ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে। সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান তো খুব কড়া!

জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি করলে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা

আবার বিদ্যে জাহির করতে গেছে—'একেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

[দূতের প্রবেশ]

সকলে। কি হে, খবর কি ?

দূত। আজ্ঞে, আমি এইমাত্র আসছি—

লক্ষ্মণ। ব্যস ! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি !

জাম্বুবান। এইমাত্র আসছ ? তোপ ফেলতে হবে ?

রাম। আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুছিয়ে বল।

দূত। আজ্ঞে, আমি ছান-টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি—অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন ? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—

সকলে। বাজে বকিসনে—কাজের কথা বল্।

দূত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দু-তিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাক-ঢোল বাজছে—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যারা—

সকলে। মার—ব্যাটাকে মার—ব্যাটার কান কেটে দে !

জাম্বুবান। ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা—চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল !

সুগ্রীব। ব্যাটা, তুই ভালো করে ধারাবাহিকরূপে আদ্যো-
পান্ত পর্যায় পরম্পরা সব বলবি কি না?

বাম। তারপরে কি হল শুনি—ততঃ কিম্?

দূত। (গান) আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। লাখো লাখো সৈন্য চলে সাথে সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে পশ্চাতে।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। বীর দর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরাতল।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। আজি দুর্দিনে নাহি কারো রক্ষা
দলে বলে সবে পাবি আজি অক্কা।

জাম্বুবান। চোপরাও বেয়াদব! মুখ সামলে কথা বলিস।

বাম। তুমি রাবণকে দেখেছ, এখান থেকে কত দূরে?

দূত। আজ্ঞে, এখেন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাঁচ ঘণ্টা, না পঁচিশ ঘণ্টা!

দূত। আজ্ঞে একটু দ্রুত হাঁটলে পোয়া ঘণ্টা হতে পারে।

জাম্বুবান। তুমি কি করে আসছিলে? হামাগুড়ি দিয়ে?

রাম। কোনদিকে আসছিল, বল তো?

দূত। আজ্ঞে, তা তো জিগ্‌গেস করিনি!

সকলে। ব্যাটা! তুমি আছ কোন কর্মে?

রাম। তাড়াতাড়ি আসছিল, না আস্তে-আস্তে?

দূত। আজ্ঞে, তাড়াতাড়ি—আজ্ঞে আস্তে। আজ্ঞে সেটা ঠিক ঠাওর করে দেখিনি!

সকলে। এটা কোথাকার অপদার্থ রে? দে, ওটাকে তাড়িয়ে দে।

বিভীষণ। (জাম্বুবানের প্রতি) মন্ত্রীমশাই! একটা কথা শুনুন! কানে-কানে বলব—

জাম্বুবান। উঃ-তুৎ! বনমানুষ কোথাকার! তোর দাড়িতে ভারি গন্ধ! শুনব না—

দূত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হা

বিভীষণ। বেটা হাসছিস কেন রে বেয়াদব?

[বিভীষণের দূতকে প্রহার ও অর্ধচন্দ্র]

সুগ্রীব। ওরে, কে কোথায় আছিস? আমার গদাটা নিয়ে আয় তো।

সকলে। কেন? গদা কেন?

সুগ্রীব। রাবণকে ঠ্যাঙাব!

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। রাবণ বোধহয় আসছে!

সকলে। যা—যা, ব্যাটা এতক্ষণে এক বাসি সংবাদ নিয়ে এসেছে!

সুগ্রীব। চল হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে—

[সকলের উত্থান ও প্রস্থান]

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধয়স্থ কাব্যস্থ প্রথমো স্বর্গঃ]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য। রণস্থল ॥

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। (ভয়ে ভয়ে) কেউ নেই তো?

[সুগ্রীবের পদচারণা। বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। দেখ, হাঁটছে দেখ—বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা!—দুৎ! যুদ্ধ করতে এসেছিস, ওমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!—এমনি করে হাঁট।

[বিভীষণের হাঁটার নমুনা প্রদর্শন]

সুগ্রীব। রেখে দাও তোমার ভড়ং! আমাদের দেশে ওরকম হাড়গিলের মতো করে হাঁটে না।

বিভীষণ। তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ তো!

সুগ্রীব। মানুষ বললে কেন হে? খামকা গালি দিচ্ছ কেন?

[নেপথ্যে জাম্বুবানের কণ্ঠস্বর]

জাম্বুবান। ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে।

বিভীষণ ও সুগ্রীব। অ্যা—কি ?

[গান]

যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়—
তবে তুই মরে যাবি—তবে তুই ম-রে-যা-বি-
ওরে, পালিয়ে যারে পালিয়ে যা
তা না হলে মরে যাবি—
লগুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।

বিভীষণ। ওরে আমার মনে পড়েছে—একটা বড্ড জরুরী কাজ বাকি আছে—সেটা চট করে সেরে আসছি।

[বিভীষণের প্রস্থান]

সুগ্রীব। এইবার বোধহয় রাবণ আসবে—আজ একটা কিছু হয়ে যাবে—ইসপার নয় উসপার—

[রাবণের প্রবেশ]

[গান]

সুগ্রীব। তবেরে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারব ঝ্যাটা
তোরে এখন রাখবে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল্।
(তোর) মুখের দুপাটি দন্ত
ভাঙিয়া করিব অন্ত

তোর এখনি হবে প্রাণান্ত

আয়রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্ ॥

রাবণ। ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব।

যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব ॥

ব্যাটা গুলিখোর বুদ্ধি নেই তোর নেহাত তুই চ্যাংড়া।

আয় তবে আয় যষ্টির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া ॥

সুগ্রীব। রেখে দে তোর গলাবাজি

ওরে ব্যাটা ছুঁচো পাজি

অন্তিম সময় আজি

ইষ্টদেবে কররে নমস্কার।

তুইরে পাষণ্ড ঘোর

পাল্লায় পড়িলি মোর

উদ্ধার না দেখি তোর

মোর হাতে না পাবি নিস্তার ॥

রাবণ। ওরে বেয়াদব কহিলে যে সব

ক্ষমা যোগ্য নহে কখন

তার প্রতিশোধ পাবিরে নির্বোধ

পাঠাব শমন সদন ॥

[রাবণের সুগ্রীবকে প্রহার]

সুগ্রীব। ওরে বাবা ইকী লাঠি

গেল বুঝি মাথা ফাটি

নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে!
কাজ নেইরে খোঁচা খুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে?

[সুগ্রীবের পলায়ন]

রাবণ। ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্! শেম্!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ ও রাবণের গান]

রাবণ। আমার সহিতে লড়াই করিতে
আগ্রহ দেখি যে নিতান্ত
বুঝেছি এবার ওরে দুরাচার
ডেকেছে তোরে কৃতান্ত।
আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি?
কোথায় লাগে বা কুরো পাট্‌কিন্
কোথায় রোজেদ্ ভেনিস্কি?
এই যে অস্ত্র দেখিছ স্পষ্ট
শোভিছে আমার হস্তে
ইহারই প্রভাবে যমালয়ে যাবে
বানর কুল সমস্তে।
অযোধ্যার লোকে যোদ্ধা হয়েছে
শুনে মরি আমি হাসিয়া

(আজি) দেখাব শক্তি রাখিব কীর্তি
দলে বলে সবে নাশিয়া ॥

[লক্ষ্মণের লাঠি চালনা]

লক্ষ্মণ। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—হর হর হর হর—মার, মার, মার, মার —কাট কাট কাট কাট কাট কাট—

[লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত]

লক্ষ্মণ। হা হতোস্মি!

[লক্ষ্মণের পতন ও মূর্ছা। রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন। হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। অ্যাঁ! কি হচ্ছে—দেখে ফেলেছি!

[রাবণের পলায়ন। বানরগণের প্রবেশ ও গান]

বানরগণ। অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো—
যষ্ঠির বাড়ি সুগ্রীবে মারি
কল্লে যে তার মাথা গুঁড়ো,
অবাক করলে রাবণ বুড়ো ॥
(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরি চাচা খুড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো ॥
(আরে) গদা ঘুরাইয়া দিল উড়াইয়া
লক্ষ্মণেরি ধড়া চুড়ো—
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো ॥

(ওরে) লক্ষ্মণে মেরে বানর দলেরে
কল্লে ব্যাটা তাড়াহুড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো ॥
(ব্যাটা) বুদ্ধি বিপুল যুদ্ধে নিপুণ
কিন্তু ব্যাটা বেজায় ভুঁড়ো,
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো ॥

[লক্ষ্মণকে লইয়া বানরগণের প্রস্থান]

[সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য দ্বিতীয়ো সর্গঃ]

॥ তৃতীয় দৃশ্য । রামচন্দ্রের শিবির ॥

রাম। কিছু আগে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল—বোধহয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে।

বিভীষণ। তা হবে!

[খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে ব্যাণ্ডেজ বদ্ধ সুগ্রীবের সকাতর প্রবেশ]

বিভীষণ। আরে ও পালওয়ানজি, একি হল—ষাট ষাট ষাট।

[সকলের উচ্চহাস্য]

রাম। কি হে সুগ্রীব, তোমার যে দেখছি বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হল।

বিভীষণ। আজ্ঞে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো—

রাম। যত তেজ বুঝি তোমার মুখেই!

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ, মুখেন মারিতং জগৎ।

রাম। আমি বলি কি তুমি মস্ত যোদ্ধা।

জাম্বুবান। যোদ্ধা বলে যোদ্ধা—ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচা মারেঙ্গা।

বিভীষণ। আমি বরাবরই বলে আসছি—

সুগ্রীব। ছ্যাথ! তোর ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না—

রাম। রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি?—
পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে রুষি
সম্বরে খাদ্যোত লীলা—

জাম্বুবান। আজ্ঞে ঠিক কথা
রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে—তখনি তো মাথা তুলি
চ্যাং পুঁটি যত করে মহা আস্ফালন।

[বাইরে গোলমাল]

রাম। এত গোলমাল কিসের হে?

সুগ্রীব। রাবণ ইদিকে আসছে না তো?

জাম্বুবান ও বিভীষণ। অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ?

বিভীষণ। আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা?

জাম্বুবান। হ্যাঁরে তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি?

[জাম্বুবানের বিভীষণের কাঁধে চাপিবার চেষ্টা ও দূতের প্রবেশ]

দূত। শ্রীমান লক্ষ্মণ আসছেন।

[সকলে আশ্বস্ত]

রাম। অত হল্লা করে আসছে কেন? চেঁচাতে বারণ কর।

দূত। আজ্ঞে, তিনি আসছেন ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ, এক রকম আসছেনই বটে—মানে তাঁকে নিয়ে আসছে।

জাম্বুবান। লোকটার কান মলে তাড়িয়ে দাও তো—ব্যাটা হেঁয়ালি পাকাবার আর জায়গা পায়নি!

[লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ ও গান]

বললেন যাহা জাম্বুবান (সাবাস গণৎকার হে)
আনুপূর্বক ঘটল তাহা শুনতে চমৎকার হে।
পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে—
খাবি খেতে লাগলেন যেন ডাঙায় বোয়াল মাছ রে!
অনেক কষ্টে রইল বেঁচে—(আহা) কপাল জোরে মৈল না—
(ওরে) স্বর্গ হৈতে কিচ্ছু তবু পুষ্পবৃষ্টি হৈল না!
ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো—
তা নৈলে তো ঘটত আজি হিতে বিপরীত গো!

রাম। হায়, হায়, হায়, হায়—হায় কি হল, হায় কি হল, হায় কি হল, হায় হায় হায়—

[রামের মূর্ছা। বানরগণের মাঝে-মাঝে কলা ভক্ষণ ও শোক]

বানরগণ। হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায় কি হল-হল-হল-হল, হায় কি হল-হল-হল-হল-হল (ইত্যাদি)।

জাম্বুবান। এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিল নাকি?

সুগ্রীব। হনুমান ব্যাটা কি কচ্ছিল?

হনুমান। আমি বাতাসা খাচ্ছিলুম।

সুগ্রীব। ব্যাটা, তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাও নি?

[সুগ্রীবের গান]

শোনরে ওরে হনুমান হওরে ব্যাটা সাবধান
আগে হতে পষ্ট ব'লে রাখি
তুই ব্যাটা জানোয়ার নিষ্কর্মার অবতার
কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি ॥
কাজ কর্ম ছেড়ে ছুড়ে ঘুমোস খালি প'ড়ে প'ড়ে
অকাতরে নাকে দিয়ে তৈল—
শোনরে আদেশ মোর এই দণ্ডে আজি তোর
অষ্ট আনা জরিমানা হৈল।

হনুমান। (স্বগত) মোটে আট আনা?

বিভীষণ। তারপর, তোমাদের মতলব কি স্থির হল?

সুগ্রীব। এইবার সবাই মিলে রাবণ ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

সকলে। হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক কথা!

[জাম্বুবানের নিদ্রা। সকলের গান]

রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো
(তার) মাথায় ঢেলে ঘোল (তারে) উল্টো গাধায় তোল

(তার) কানের কাছে পিটতে থাকো চৌদ্দ হাজার ঢোল ॥
কাজ কি ব্যাটার বেঁচে (তার) চুল দাড়ি গোঁফ চেঁচে
নস্যি ঢোকাও নাকে, ব্যাটা মরুক হেঁচে হেঁচে।
(তার) গালে দাও চুন কালি (তারে) চিমটি কাটো খালি
(তার) চৌদ্দপুরুষ উড়িয়ে দাও পেড়ে গালাগালি।
(তারে) নাকাল কর আরো যে যেরকম পারো
রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো ॥

[রামচন্দ্রের মূর্ছাভঙ্গ ও গাত্রোত্থান]

বিভীষণ। এই যে, শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোৎপাটন করেছেন!
রাম। তারপরে—ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা কললে?
সকলে। ঐ যা! ওষুধপত্রের তো কিছু ব্যবস্থা হল না?
রাম। মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা?
বিভীষণ। মন্ত্রীমশাই—একটু ঘুমোচ্ছেন।
সুগ্রীব। ব্যস! তবেই কেল্লা ফতে করেছেন আর কি!
সকলে। মন্ত্রীমশাই! আরে ও মন্ত্রীমশাই, আহা একবার উঠুন না!

[সকলে মিলিয়া জাম্বুবানকে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি]

বিভীষণ। বাবা! এ যে কুম্ভকর্ণের এক কাঠি বাড়া!
জাম্বুবান। (সহসা জাগিয়া) হ্যাঁরে, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, ব্যাটা বেল্লিক, বেরসিক, বেআক্কেল, বেয়াদব—হাঁড়িমুখো ভূত!

সকলে। রাগ করবেন না—আহা রাগ করবেন না। কথাটা শুনুন।

[সকলের গান]

আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না ?
সঙ্কটকালে চটপট কেন যুক্তির কথা বলছে না ?
সর্ব কর্মে অষ্টরম্ভা হর্দম পড়ে নাক ডাকছে—
উল্টে কিছু বলতে গেলে বিটকেল বিটকেল গাল পাড়ছে।
মরছে লক্ষ্মণ জানছে তবু দেখছে চেয়ে নিশ্চিন্তে
এম্নি স্বভাব ছিল না তার থাকতাম যখন কিষ্কিন্ধে।
হ্যাঙ্গাম দেখে হটলে পরে নিন্দুক লোকে বলবে কি ?
ভেবেই দেখ এম্নি করলে রাজ্যের কার্য চলবে কি ?
মুখ্যু মোরা আক্কেল শূন্য একেবারেই বুদ্ধি নেই—
সূক্ষ্মযুক্তি বলতে কারো ঠাকুরদ্দাদার সাধ্যি নেই।
বলছি মোরা কিচ্ছু নেইকো চটবার কথা এর মধ্যে
উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাং পদ্মে॥

হনুমান। (স্বগত) হ্যারে, আমার লেজে পাড়িয়ে দিলি ?

রাম। বুঝলে হে জাম্বুবান, তুমি কিনা হচ্ছ প্রবীণ লোক—এ-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার খুব অভিজ্ঞতা আছে—

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে কথা আগে বললেই হত—তা না ব্যাটারা খালি ধাক্কাই মারছে—'মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রীমশাই'—আমি বলি বুঝি ডাকাত পড়ল নাকি ?

রাম। হ্যাঁ, এইবার একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে ফেল।

জাম্বুবান। (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে যা লিখে প্রেশক্রিপ-
শান দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান। আচ্ছা, কাল ভোর না হতে উঠে নিয়ে আসব।

জাম্বুবান। না, না, এত দেরি করলে হবে না—এখুনি যা।

হনুমান। আবার এত রাত্তিরে কোথায় যাব? সাপে কাটবে
না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব। ব্যাটা, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

জাম্বুবান। না, ওষুধগুলো এখুনি দরকার।

হনুমান। আঃ। হোমিওপ্যাথি লাগাও।

জাম্বুবান। যা বলছি শোন্। এই যা গাছের কথা লিখলাম—
বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী—এই সব গাছের শেকড় আনতে
হবে।

হনুমান। আমি ডাক্তারখানা চিনিনে।

জাম্বুবান। আ মরণ আর কি! একি কলকাতার শহর
পেয়েছিস নাকি যে বাথগেট কোম্পানি তোর জন্যে
দোকান খুলে বসবে? কৈলাস পাহাড়ের কাছে গন্ধ-
মাদন পাহাড় আছে জানিস তো?

হনুমান। কৈলেস ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান। ব্যাস! কানের পটহটা দেখি ভারি সরেস—ব্যাটা
কৈলেস পাহাড় জানিসনে?

হনুমান। ও বাবা! সেই কৈলেস পাহাড়! এত রাত্তিরে
আমি অত দূর যেতে পারব না।

জাম্বুবান। যাবিনে কি রে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল করে দেব।
এখুনি যা—দেখিস পথে মেলা দেরি করিসনে।

হনুমান। আমার কান কটকট কচ্ছে—

রাম। আহা, যারে যা, আর গোল করিসনে—নে বকশিশ নে।

[হনুমানকে রামচন্দ্রের কলা প্রদান]

হনুমান। যো হুকুম।

[কুর্নিশ করিতে-করিতে হনুমানের প্রস্থান]

জাম্বুবান। তারপর রাত্তিরের জন্যে সেনাপতি নির্বাচন কর।

রাম। কেন? রাত্তিরে যুদ্ধ করবে নাকি?

জাম্বুবান। তা কেন? একজনকে একটু খবরদারি করতে হবে তো! তা ছাড়া, হয়তো লক্ষ্মণকে নিয়ে যমদূতগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে।

সকলে। তা তো বটেই! মন্ত্রীমশাই না হলে এমন বুদ্ধি কার হয়।

সুগ্রীব। (স্বগত) হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইবার ভায়া বিভীষণকে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে ফেলতে হচ্ছে—

[সুগ্রীবের গান]

আমার বচন শুন বিভীষণ
করহ গ্রহণ সেনাপতি পদ
(আহা) সাজ সজ্জা কর, দিব্য অস্ত্র ধর
সমরে সত্বর এ মহা বিপদ
(তুমি) বিপদে নির্ভীক বীর্যে অলৌকিক

তোমার অধিক কেবা আছে আর

(আহা) জলেতে পাষাণ যায় গো ভাসান

মুশকিলে আসান প্রসাদে তোমার—

সকলে। ঠিক কথা—উত্তম কথা।

বিভীষণ। তাই তো! মুশকিলে ফেললে দেখছি।

সুগ্রাব। শুন সর্বজনে আজিকে এক্ষণে

বীর বিভীষণে কর সেনাপতি

(আহা) শ্রীরামের তরে সম্মুখ সমরে

যদি যায় মরে কিবা তাহে ক্ষতি?

সকলে। তা তো বটেই—কিছু ক্ষতি নেই।

জাম্বুবান। বেশ তো! তাহলে তাই ঠিক হল—খবরদার। দেখ, ভালো করে পাহারা দিও। কোনো ব্যাটাকে পথ ছাড়বে না—স্বয়ং যম এলেও নয়।—আর দেখ যেন ঘুমিও না।

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

বিভীষণ। ইকী গেরো! ভালো, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি!

[বিভীষণের গান]

বিধি মোর ভালে হায় কি লিখিল

আজ রাত্রে একি বিপদ ঘটিল।

দুর্মতি সুগ্রীব চির শত্রু মোর

ফেলিল আমারে সঙ্কটেতে ঘোর।

জাম্বুবান ব্যাটা কুবুদ্ধির ঢেঁকি

তার চক্রে পড়ি নিস্তার না দেখি।
আসে যদি কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে—
ঠেকাব কেমনে একাকী তাহারে?
স্বর্গ হতে কহ দেবগণ সবে
আজি এ সঙ্কটে কি উপায় হবে?
যম হস্তে আজি না দেখি নিস্তার
সুযুক্তি তাহার কহ সবিস্তার
শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর—
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন সর্বজনে মোর মৃত্যু হলে
শোকসভা করো তোমরা সকলে।

[সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণেব শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য তৃতীয়ো সর্গঃ]

॥ চতুর্থ দৃশ্য। শিবির প্রাঙ্গণ ॥

[বিভীষণের পাহাধাদারি, মধ্যে মধ্যে আয়নায় মুখাবলোকন ইত্যাদি]

বিভীষণ। জাম্বুবান বলছিলেন, দেখ যেন ঘুমিও না—বাপু এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাঁকে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি।

[বিভীষণের পদচারণা ও উঁকি-ঝুঁকি]

তবে এ-পর্যন্ত যখন কোনো দুর্ঘটনা হয়নি—তাতে আমার

কিছু-কিছু ভরসা হচ্ছে—চাই কি, হয়তো বিনা গোলযোগে বাত কাবার হয়ে যেতে পারে। যাক! একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের তো ইদিকে আসবার কোনোই গতিক দেখছি না—আর, আসলেই বা কি? তাকে বাধা দেওয়াটা তো আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না!

[বিভীষণের উপবেশন ও অচিরাৎ নিদ্রা। জাম্ববানের প্রবেশ]

জাম্বুবান। দেখেছ, আধ ঘণ্টা না যেতেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে নাক ডাকাতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ!

বিভীষণ। (লাফাইয়া উঠিয়া) কে! কে! ও—জাম্বুবান যে—তুই বুঝি মনে করিছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোইনি।

জাম্বুবান। হ্যা—হ্যাঁ—আমায় আর সমঝাতে হবে না। দিব্যি পড়ে নাক ডাকছে—আবার বলে, সত্যি করে ঘুমোইনি।

বিভীষণ। তুই টের পাসনি?—আমি মিটমিট করে চেয়ে দেখছিলাম।

জাম্বুবান। না-না—মিটমিট করে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে।

[জাম্বুবানের প্রস্থান]

বিভীষণ। ব্যাটা তো ভারি জোচ্চোর! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

[বিভীষণের পুনরুপবেশন ও পুনর্নিদ্রা। যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ]

প্রথম দূত। হ্যাঁরে, বাড়িটা ঠিক চিনে এসেছিস তো?

দ্বিতীয় দূত। আরে, হ্যাঁরে, হ্যাঁ, এতদিন কাজ করেছি, একটা বাড়ি চিনতে পারব না?

প্রথম দূত। তোকে কি বাতলিয়ে দিয়েছিল বল্ তো?

দ্বিতীয় দূত। আমাকে বলে দিয়েছে, যে, ডানদিকের উঠোন-ওয়ালা বাড়িটায় যাবি।

প্রথম দূত। ডানদিক তো এই—আর উঠোনকে উঠোন মিলে গেছে, তবে তো ঠিকই এসেছি—

দ্বিতীয় দূত। হ্যাঁ, চল্—মড়াটা খুঁজে দেখি!

[অন্বেষণ করিতে-করিতে দূতদ্বয়ের বিভীষণোপরি পতন]

বিভীষণ। কেরে। কেরে!

[দূতদ্বয়ের লাফাইয়া তিন হাত দূরে গমন]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। এটা কি আছে রে! এটা কি আছে রে!

দ্বিতীয় দূত। ও বাপ্পো—এ মানুষ আছে নাকি?

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ও বাপ্পো—মানুষ? জীয়ন্ত মানুষ?

[দূতদ্বয় ভয়ে কম্পিত]

দ্বিতীয় দূত। কৈ বে কিচ্ছু তো বলছে না!

প্রথম দূত। তাহলে বোধহয় কিচ্ছু বলবে না।

দ্বিতীয় দূত। হ্যাঁ, বেশ অমায়িক চেহারা! ওকে জিগগেস কর তো?

প্রথম দূত। তুই জিগগেস কর!

দ্বিতীয় দূত। তুই জিগগেস কর না! আমি তোকে ধরে থাকব—

প্রথম দূত। মশাই গো—মশাই—শুনুন মশাই—একটু পথ ছেড়ে দেবেন মশাই—গরীব বেচারা মশাই—

বিভীষণ। (স্বগত) এ তো মজা মন্দ নয়! এরা দেখছি আমার ভয়ে থরহরি কম্পমান।

প্রথম দূত। চল একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাই!

[দূতদ্বয়ের পাশ কাটিয়া যাইবার উদ্যোগ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ওরে নারে, চোখ রাঙাচ্ছে।

[দূতদ্বয়ের গান]

দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো
তোমার প্রাণে একটুও কি দয়ামায়া নাই গো।
তোমার তুল্য খাঁটি বন্ধু আর কাহারে পাই গো?
তুমি ভরসা নাহি দিলে অন্য কোথা যাই গো!
এ সময়ে তোমা ভিন্ন কে আছে সহায় গো—
কার্যোদ্ধার না হলে তো না দেখি উপায় গো।
পথ ছেড়ে দাও মুক্ত কণ্ঠে তোমার গুণ গাই গো
দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো॥

বিভীষণ। ভাগ ব্যাটারা, নইলে একেবারে প্রহারেন ধনঞ্জয় করে দেব।

[উভয় দূতের পলায়ন ও পুনঃপ্রবেশ]

প্রথম দূত। হ্যাঁরে, পালাচ্ছিস কোথা? খালি হাতে গেলে যমরাজা কাউকে আস্ত রাখবেন না।

দ্বিতীয় দূত। তাই তো! তাই তো! এ তো ভারি মুশকিল হল—কি করা যায় বল্ দেখি?

প্রথম দূত। আয় না, আমরা ও ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে।

[দূতদ্বয়ের গান]

দ্বিতীয় দূত। যখন পরাজয় খলু অনিবার্য
তখন যুদ্ধ কি বুদ্ধির কার্য?

প্রথম দূত। তবে তো মুশকিল উপায় কি হবে?
সাধ করে কেবল প্রাণটা হারাবে?

দ্বিতীয় দূত। আমিও তাই বলি লড়ায়ে কাজ নাই—
কাজেতে ইস্তফা এখনি দাও ভাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। হায় কি ঘটিল হায় কি ঘটিল
এমন সাধের চাকুরি ঘুচিল!

বিভীষণ। ব্যাটারা রাত দুপুরে গান জুড়েছিস—চাবকিয়ে রোগা করে দেব।

[দূতদ্বয় প্রস্থানোদ্যত ও দ্বারদেশে যমসহ সাক্ষাৎ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। দোহাই মহারাজ, দোহাই যমরাজা, আমাদের কিছু দোষ নেই—ওই এক ব্যাটা আমাদের পথ ছাড়ছে না।

[যমের প্রবেশ]

বিভীষণ। এই মাটি করেছে—এখন উপায়? আটকাতে গেলে

যম মারবে, না আটকালে রাম মারবে। উভয় সঙ্কট! যা থাকে কপালে, ব্যাটাকে পথ ছাড়ব না। (সদর্পে) তবে রে ব্যাটা—আমায় চিনিসনে? আমি থাকতে তুই ঢুকবি?

[যমের অগ্রসর হওয়া]

দ্বিতীয় দূত। ওরে এবার লড়াই বাধবে—

প্রথম দূত। হ্যাঁরে ভারি মজা দেখা যাবে—

দ্বিতীয় দূত। (বিভীষণের প্রতি) পালা, পালা—এই বেলা পালা—

প্রথম দূত। হ্যাঁ, ঐ যে অস্তর দেখছ ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্ট প্রাপ্তি।

বিভীষণ। তুই কে রে ব্যাটা মরতে এসেছিস?

[যমের আবৃত্তি]

কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি—
সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি॥
সর্বকালে সমভাব সকলের প্রতি,
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি॥
অন্তিমেতে দেখা দেই কৃতান্তের বেশে—
মোর সাথে পরিচয় জীবনের শেষে॥
সংসারের মহাযাত্রা ফুরায় যেমন—
শ্রান্তজনে শান্তি দেই আমিই শমন॥

[পাহাড় লইয়া হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। জয় রামের জয়!

[যমের মাথায় হনুমানের পাহাড় স্থাপন। যমের পতন]

প্রথম দূত। ও কিরে!

দ্বিতীয় দূত। ঐ যা! চাপা পড়ে গেল!

প্রথম দূত। তাই তো রে, চাপা পড়ল যে!

দ্বিতীয় দূত। (সকাতরে) হ্যাঁরে আমার মাইনে কে দেবে?

প্রথম দূত। তাই তো। আমারও যে পাওনা আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ওগো, আমাদের কি হল গো—ওগো, আমরা যে ধনে-প্রাণে মলুম গো—(হনুমানের প্রতি) পালোয়ান মশাই গো—সর্বনাশ কললেন গো—হায়, আমাদের কি হল গো—

[দূতদ্বয়ের গান]

প্রথম দূত। ওরে যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি

দ্বিতীয় দূত। মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি

প্রথম দূত। আহা দেখ না ব্যাটা হল নাকি?

দ্বিতীয় দূত। ওরে চুলে ধরে দে না ঝাঁকি।

প্রথম দূত। এই বিপদকালে কারে ডাকি
হায় হায় যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি।—অ্যাঁক্

[হনুমান কর্তৃক দূতদ্বয়ের গলা পাকড়ানো]

হনুমান। ভাগ! ভাগ!—ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেধেছে।

[দূতদ্বয়ের প্রস্থান]

বিভীষণ। এবার সকলকে ডেকে নিয়ে আয়—

[হনুমানের প্রস্থান। লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া হনুমানের সহিত সকলের প্রবেশ]

সকলে। ওটা কিরে? ওটা কিরে?

হনুমান। আজ্ঞে, উপরেরটা গন্ধমাদন পাহাড়!

জাম্বুবান। ব্যাটা গোমুখ্খু কোথাকার, পাহাড়সুদ্ধু নিয়ে এসেছিস?

হনুমান। আজ্ঞে, গাছ চিনিনে। আর ঐ নিচেরটা—যমরাজা।

সকলে। আরে, আরে করেছিস কিরে ব্যাটা? করেছিস কি?

জাম্বুবান। থাক, ওমনি থাক। আগে লক্ষ্মণের একটা কিছু গতিক করে নিই, তারপর দেখা যাবে—

[ঔষধান্বেষণ—ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ]

সকলে। বা, বা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি সাফাই ওষুধ রে!

হনুমান। হাজার হোক—স্বদেশী ওষুধ তো!

সকলে। তাই বল। স্বদেশী না হলে কি এমন হয়।

জাম্বুবান। হ্যাঁ, এইবার যমকে ছেড়ে দাও।

[পাহাড় সরাইয়া হনুমানের যমকে মুক্তিদান]

যম। (চোখ রগড়াইয়া লক্ষ্মণের প্রতি) সেকি! আপনি তবে বেঁচে আছেন?

লক্ষ্মণ। তা না তো কি? তুমি জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে থেকে?

যম। আজ্ঞে, চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখুনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি—

[যমের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। হনুমান ব্যাটা বুঝি ওকে চাপা দিয়েছিল—ব্যাটার বুদ্ধি দেখ।

হনুমান। তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক—ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি তো।

বিভীষণ। আমি পাহারা না দিলে ওষুধ কি হত রে—ওষুধ আনতে-আনতে যমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমারই তো বাহাদুরি।

সুগ্রীব। অর্থাৎ কিনা আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে তো বিভীষণ পাহারা দিলে—আর বিভীষণ পাহারা দিলে বলেই তো যমদূতগুলো আটকা পড়ল।

জাম্বুবান। আরে ব্যাটা ওষুধের ব্যবস্থা করলে কে? তোদের বুদ্ধি সে সময় উড়ে গেছিল কোথায়?

রাম। হ্যাঁ, সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তি-র কথা না জিগগেস করলে তুমি হয়তো এখনো পড়ে নাক ডাকাতে।

লক্ষ্মণ। আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম তবে তো এসব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না—আর তোমরাও বিদ্যা জাহির করতে পারতে না।

জাম্বুবান। যাক, এখন মেলা রাত হয়ে গেছে, তোমরা স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নিদ্রার চেষ্টা দেখ—তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে আর আমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচব।

হনুমান। আমায় কিছু বকশিশ দেবে না?

বিভীষণ। হ্যাঁ, ওকে চারটি বাতাসা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দাও।

প্রথম। আমার কথাটি ফুরোলো

দ্বিতীয়। নটে গাছটি মুড়োলো।

তৃতীয়। ক্যান্‌রে নটে মুড়োলি

চতুর্থ। বেশ করেছি—তোর তাতে কিরে ব্যাটা।

সকলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণেব শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য চতুর্থ সর্গঃ)

অবাক
জলপান

অবাক জলপান

পাত্রগণ

পথিক

ঝুড়িওয়ালা

প্রথম বৃদ্ধ

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

ছোকরা

খোকা

মামা

॥ প্রথম দৃশ্য। রাজপথ ॥

[ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ, পিঠে লাঠি, লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি, উস্কোখুস্কো চুল, শ্রান্ত চেহারা]

পথিক। নাঃ—একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনো প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তর বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও তো লোকজন দেখছিনে।—ঐ একজন আসছে! ওকেই জিগ্‌গেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি—

পথিক। না, না, আমি তা বলিনি—

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক। না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে—

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কি?

পথিক। আপনি ভুল বুঝেছেন—আমি জল চাচ্ছিলাম—

ঝুড়িওয়ালা। জল চাচ্ছেন তো জল বললেই হয়—'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক। ঘাট হয়েছে মশায়। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি —তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[ঝুড়িওয়ালার প্রস্থান]

পথিক। দেখলে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে! যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ].

বৃদ্ধ। কে ও? গোপ্‌লা নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না, আমি পুবগাঁয়ের লোক—একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম—

বৃদ্ধ। বল কিহে? পুবগাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ

করতে?—হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা-া-র জল।

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে-হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। তা তো পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন-[illegible] জল তো খাওনি কখনো!—বলি ঘুম্‌ড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাইনি—

বৃদ্ধ। খাওনি? অ্যাঃ! ঘুম্‌ড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি—আদাত জলের জায়গা। সেখানকার জল, সে কি বলব তোমায়? কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল—কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন কেওড়া-দেওয়া সরবৎ!

পথিক। তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন—আপাতত এই তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃদ্ধ। তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই তো পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? 'যা হয় একটা হলেই হল' ও আবার কি রকম কথা? আর

অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না—ব্যস। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঃ—

[রাগে গজগজ করিতে-করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান। পাশের এক বাড়ির জানলা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহির করণ]

বৃদ্ধ। কি হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক। আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না—কেবলই সাত-পাঁচ গপ্পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগে-মেগে অস্থির!

বৃদ্ধ। আরে দূর-দূর! তুমিও যেমন! জিগগেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বলবেই বা কি? ওর দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বললে তোমায়?

পথিক। কি জানি মশাই—জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল, বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে—

বৃদ্ধ। হুঁঃ—ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল—

বৃদ্ধ। কি বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ-ল, আহ্লাদে গলে জ—ল, গায়েব রক্ত জ—ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ—ল —কটা হল? গোনোনি বুঝি?

পথিক। না মশাই, গুনিনি—আমার আব খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

বৃদ্ধ। তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিও না—একেবারে অপদার্থের একশেষ!

[বৃদ্ধেব সশব্দে জানলা বন্ধ কবণ]

পথিক। নাঃ, আর জল-টল চেয়ে কাজ নেই—এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুর-টুকুর পাই কি না।

[লম্বা-লম্বা চুল, চোখে সোনাব চশমা, হাতে খাতা-পেন্সিল, পায়ে কটকা জুতো, একটি ছোকবাব প্রবেশ]

লোকটা নেহাত এসে পড়েছে যখন একটু জিগগেস করে দেখি। মশাই, আমি অনেক দূব থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে কোথাও?

ছোকরা। কি বলছেন? 'জল' মিলবে না? খুব মিলবে। একশোবার মিলবে! দাঁড়ান এক্ষুনি মিলিয়ে দিচ্ছি—জল চল তল বল কল ফল—মিলের অভাব কি? কাজল-সজল-উজ্জ্বল-জ্বলজ্বল—চঞ্চল চল চল, আঁখিজল ছলছল,

নদী জল কলকল হাসি শুনে খলখল, অ্যাকানল ব্যাকানল,
আগল ছাগল পাগল—কত চান ?

পথিক। এ দেখি আরেক পাগল! মশাই আমি সে রকম মিলবার কথা বলিনি।

ছোকরা। তবে কোন রকম মিল চাচ্ছেন বলুন ? কি রকম, কোন ছন্দ, সব বলে দিন—যেমনটি চাইবেন তেমনটি করে মিলিয়ে দেব।

পথিক। (স্বগত) ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি—(জোরে) মশাই! আর কিছু চাইনে. (আরো জোরে) শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোকরা। ও, বুঝেছি! শুধু—একটু—জল—খেতে—চাই। এই তো ? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন ?—
শুধু একটু জল খেতে চাই—ভারি তেষ্টা প্রাণ আই-ঢাই।
চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই—বল্ শীঘ্র বল্ না রে ভাই।
কেমন ঠিক মিলছে তো ?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিলছে—খাসা মিলছে—নমস্কার। (সরিয়া গিয়া) নাঃ, বকে-বকে মাথা ধরিয়ে দিলে—একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই।

[পথিক একটা বাড়ির ছায়ায় গিয়া বসিল]

ছোকরা। (খুশি হইয়া লিখিতে-লিখিতে) মিলবে না ? বলি, মেলাচ্ছে কে ? সেবার যখন বিষ্টুদা 'বৈকাল' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'নৈপাল' বলে

দিয়েছিল কে? নৈপাল কাকে বলে জানেন তো? নেপালের লোক হল নৈপাল। (পথিককে না দেখিয়া) লোকটা গেল কোথায়? দুত্তেরি!

[ছোকবার প্রস্থান। নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]

নেপথ্যে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ।

পথিক। ওহে খোকা! একটু এদিকে শুনে যাও তো?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ?—(পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনো ছোকরা বুঝি। তা—আপনার কি দরকার?

পথিক। আজ্ঞে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি—তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

[মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]

মামা। কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিগগেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

[পথিককে মামার ঘরের মধ্যে টানিয়া নেওয়া]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য। ঘরের ভিতর ॥

[ঘর নানারকম যন্ত্র, নক্সা, রাশি-রাশি বই ইত্যাদিতে সজ্জিত]

মামা। কি বলছিলেন? জলের কথা জিগগেস করছিলেন না?

পথিক। আজ্ঞে হ্যা, সেই সকাল থেকে হাঁটতে-হাঁটতে আসছি।

মামা। আ হা হা! কি উৎসাহ! কি আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এ রকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে, বলুন তো? বসুন! বসুন! (কতগুলি ছবি, বই আর এক টুকরা খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কি গুণ—

পথিক। আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি—

মামা। আসছে—ব্যস্ত হবেন না। একে-একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন—

[মামা বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখিলেন—$H_2+O=H_2O$]

পথিক। এই মাটি করেছে!

মামা। বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনেছেন তো?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে আরো মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা। (বেশ তো! খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। খাবার জল কাকে বলে? না, যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নেই, রোগের বীজ নেই—কেমন? এই দেখুন এক শিশি জল—আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে) কেঁচোর মতো ক্রিমির মতো সব পোকা—এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এতো বড়-বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন, ও বাড়ির পুকুরের জল; আমি এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজগিজ করছে—প্লেগ, টাইফয়েড, ওলাউঠা, ঘোয়াজ্বর—ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এর ছবি দেখুন—এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই ডিপথিরিয়া, এই নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া—সব আছে। (আর এই সব হচ্ছে জলের পোকা—জলের মধ্যে শেওলা ময়লা যা কিছু থাকে, ওরা সেইগুলো খায়। আর এই জলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল—ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ)

পথিক। উ হুঁ হুঁ হুঁ! করেন কি মশাই? ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই—

মামা। খুব দরকার আছে। এ সব জানতে হয়—অত্যন্ত দরকারী কথা।

পথিক। হোক দরকারী, আমি জানতে চাইনে, এখন আমার সময় নেই।

মামা। এই তো জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কি? জলে কি-কি দোষ থাকে, কি করে সব ধরতে হয়, কি করে তার শোধন হয়, এসব কি জানবার মতো কথা নয়? এই যে সব নদীর জল সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল সব বাষ্প হয়ে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে—এরকম কেন হয়, তাও তো জানা দরকার?

পথিক। দেখুন মশাই! কি করে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা তো ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল-জল করছে তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা। শুনেছি বৈকি—চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হল [illegible]। আর জল খেতে পারে না—যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুশকিল!—

শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়াল, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়ল—তারপর সে জল খেয়ে বাঁচল। ওরকম হয়।

পথিক। নাঃ, এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না—কেনই বা মরতে এয়েছিলাম এখেনে? বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা। আছে বৈকি! এই দেখুন না বোতলভরা টাটকা খাঁটি 'ডিষ্টিল ওয়াটার'—যাকে বলে 'পরিশ্রুত জল'।

[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

পথিক। (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা। না, ও জল খায় না ওতে তো স্বাদ নেই—একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল—এখনো গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলাম শুনুন—এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল—এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপী জল ঢেলে দিলুম—ব্যস, গোলাপী রঙ উড়ে শাদা হয়ে গেল। দেখলেন তো?

পথিক। না মশাই, কিচ্ছু দেখিনি, কিছু বুঝতে পারিনি, কিচ্ছু মানি না ও কিচ্ছু বিশ্বাস করি না—

মামা। কি বললেন! আমার কথা বিশ্বাস করেন না?

পথিক। না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা। বটে! কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি—আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি—

পথিক। তাহলে দেখান দেখি। শাদা, খাঁটি, চমৎকার এক গেলাশ খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিচ্ছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাশ ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো!

মামা। এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি—ওরে ট্যাঁপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাশ জল নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। এ জলে কি রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কি রকম তফাত হয়, সব আমি এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাঁপার প্রবেশ]

রাখ, এইখানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া পথিকের এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ করা]

পথিক। আঃ, বাঁচা গেল!

মামা। (চটিয়া) এটা কি রকম হল মশাই?

পথিক। পরীক্ষা হল—এক্সপেরিমেণ্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো, কি রকম হয়?

মামা। (ভীষণ রাগিয়া) কি বললেন!

পথিক। আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন—পরে খাবেন এখন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন—আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার!

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান। পাশের গলিতে সুর করিয়া কে হাঁকিতে লাগিল—'অবাক জলপান']

হিংসুটে

হিংসুটে

হিংস্থটে

পাত্রীগণ

পাঁচটি মেয়ে

স্বপ্নবুড়ি

হিংসে

॥ প্রথম দৃশ্য । উদ্যান-সংলগ্ন বারান্দা ॥

[পাঁচটি ছোট মেয়েব প্রবেশ]

প্রথম। আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছি—এমন মজার।

দ্বিতীয়, তৃতীয়। কি ভাই—কি স্বপ্ন?

চতুর্থ, পঞ্চম। বল্ না ভাই—

প্রথম। না ভাই, আমি ঐ ওকে বলব না—ও ভারি হিংসুটে।

পঞ্চম। আচ্ছা, নাই বা বললি। ভারি তো স্বপ্ন—আমি বুঝি আর স্বপ্ন দেখতে জানিনে—

প্রথম। দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে!

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আচ্ছা, ওকে নাই বা বললি, আমাদের বল্ না।

চতুর্থ। আর না হয় ও শুনলই বা—তাতে দোষ কি ভাই?

পঞ্চম। আমার বয়ে গেছে—ও ছাই স্বপ্ন আমি একটুও শুনতে চাই না।

প্রথম। শুনলি ভাই! কি রকম হিংসে করে-করে কথা কয়? আমি ওকে শুনতে বলেছি?

চতুর্থ। কিসের স্বপ্ন ভাই?—রাজহাঁসের?

প্রথম। দুৎ! রাজহাঁসের স্বপ্নকে বুঝি মজার স্বপ্ন বলে?

চতুর্থ। হ্যাঁ—রাজহাঁসের স্বপ্ন খুব মজার হয়। আমি যখন রাজহাঁসদের সঙ্গে মেঘের মধ্যে ভাসছিলাম, তখন নীল-নীল ঢেউগুলো সব আমার গায়ে লাগছিল। আর তারাগুলো

সব ফুটেছিল, ঠিক যেন পদ্মফুলের মতো! আমার খুব মজা লাগছিল।

পঞ্চম। তুই সেখানে দোলনা-দেওয়া লালফুলের বাগান দেখেছিলি?—আর পেখমধরা ময়ূর দেখেছিলি?

চতুর্থ। কই, না তো!

পঞ্চম। আমি দেখেছিলাম। ময়ূরদের পায়ে সোনার ঘুঙুর এমনি সুন্দর বাজছিল! এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুনলাম সকালবেলায় বোর্ডিঙের ঘণ্টা বাজছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, এর মধ্যে কি রকম বকবক করতে লেগেছে! ওরা ইচ্ছে করে আমায় বলতে দেবে না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আহা, তোরা একটু থাম না বাপু—

প্রথম। আবার কিন্তু ও রকম করলে আমি কক্ষনো বলব না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। না, না, কেউ বাধা দেব না—বল্।

প্রথম। আমি স্বপ্ন দেখেছি—ঐ বাগানের মধ্যে একটা মেলা হচ্ছে। আমি সেই মেলায় গিয়েছি, আর সেখানে এক মেম সকলকে পুতুল দিচ্ছে—ঠিক এত্তো বড়-বড় পুতুল!—তার জন্যে পয়সা নিচ্ছে না! আমায় একটা পুতুল দিল, তার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, এমনি মোটা-মোটা গাল, আর ঠিক সত্যিকার মানুষের মতন কথা বলে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। ও—মা! কি চমৎকার!

তৃতীয়। হাত-পা নাড়তে পারে?

চতুর্থ। নিজে-নিজে চলতে পারে?

দ্বিতীয়। হাসতে পারে?

প্রথম। হ্যাঁ, হাসতে পারে, খেলতে পারে, সব পারে।

পঞ্চম। সত্যিকার মানুষের মতন তৈরি?

দ্বিতীয়। কেন—এখন যে বড় কথা বলতে এয়েছিস?

তৃতীয়। তবে যে বলছিলি ছাই স্বপ্ন—তুই একটুও শুনতে চাস না—

চতুর্থ। তা কেন? তোরাই তো ভাই ওকে শুনতে দিচ্ছিলি না।

প্রথম। বেশ করেছি। ও কেন কথায়-কথায় হিংসে করে? তারপর শোন—সবাইকে পুতুল দিল, কিন্তু কারো পুতুল ও রকম কথাও কয় না, খেলাও করে না—আর, ঐ ও একটা পুতুল পেয়েছিল—নোংরা, কালো, দাঁত ভাঙা, বিচ্ছিরি মতন।

পঞ্চম। ইস! তা বৈকি! নিজের বেলায় সব ভালো-ভালো, আর পরের বেলায় সব নোংরা আর ময়লা আর বিচ্ছিরি!

প্রথম। দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে করে-করে বলছে! মেমসাহেব ও রকম দিয়েছে, তা আমি কি করব ভাই?

তৃতীয়। হ্যাঁ, তা ছাড়া এ তো সত্যি নয়—স্বপ্ন।

দ্বিতীয়। স্বপ্ন নিয়ে আবার হিংসে কি? ছি-ছি-ছি!

চতুর্থ। হ্যাঁ—তারপর কি হল ভাই?

প্রথম। তারপর সে পুতুল নিয়ে কত মজা হল—সব আমার মনেও নেই। শেষটায় কিন্তু ভাই আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কেন, কি হয়েছিল ?

প্রথম। সে ভাই কি বলব—পুতুলটাকে সবাই নিয়ে দেখছে, হঠাৎ দেখি পুতুলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আমার ভাই এমন কান্না পেতে লাগল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কি করে ভাঙল ভাই ?

প্রথম। কি জানি, কি করে! আমার বোধহয়, নিশ্চয় ঐ হিংসুটিটা কখন হিংসে করে ভেঙে দিয়েছিল!

পঞ্চম। মাগো! এমন বানিয়ে-বানিয়ে বলতে পারে আমার নামে!

প্রথম। তা বৈকি! যারা হিংসুটি, তারা স্বপ্নেও হিংসুটি হয়।

দ্বিত হয় না তো কি ? নিশ্চয়ই হয়।—হিংসুটি! হিংসুটি!

তৃতীয়। আমি কিন্তু ভাই যেদিন স্বপ্নে পথ হারিয়েছিলুম, সেদিন ও-ই আমায় বলে দিয়েছিল।

চতুর্থ। কি করে পথ হারিয়েছিলি ভাই ?

তৃতীয়। সেই একটা বাগানের মধ্যে এক বুড়ি একটা কাঠি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সবাইকে পাথর করে দিচ্ছিল—আর আমি কিছুতেই পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর ও এসে আমায় একটা লুকোনো পথ দেখিয়ে দিল, সেইখেন দিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম।

চতুর্থ। তবু কিন্তু ভাই ওরা ওকে হিংসুটি বলে! আচ্ছা ভাই, তুই বুঝি খালি ময়ূরের স্বপ্ন দেখিস?

পঞ্চম। না—সে খালি একদিন দেখেছিলাম। অন্য সময়ে আমি আল্‌তা মাসির স্বপ্ন দেখি।

তৃতীয়, চতুর্থ। আল্‌তা মাসি কে ভাই?

পঞ্চম। সে আমার একজন মাসি হয়। তার কেউ নেই কিনা, সব মরে গিয়েছে, তাই সে রোজ-রোজ কাঁদে। আমি ভাই স্বপ্ন দেখি, আল্‌তা মাসির খোকাকে কত করে খুঁজছি, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আর আল্‌তা মাসির চোখ দিয়ে কেবলি জল পড়ছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমার দেখাদেখি ও আবার এক স্বপ্ন বলতে লেগেছে। এমন হিংসুটে!

দ্বিতীয়। ওঃ! আমার ভাই বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

তৃতীয়, চতুর্থ। সত্যি, আমারও!

প্রথম। আমারও ভাই ঘুম পেয়ে গেল!

পঞ্চম। হ্যাঁ, তাই তো! চোখ বুজে আসছে যে!

[একে-একে সকলে বসিয়া পড়িল, ঘুমে চোখ ঢুলিতে লাগিল। স্বপ্নবুড়ি স্বপ্নের গান গাহিতে-গাহিতে সকলের চোখে ঘুমের কাঠি বুলাইয়া দিল। রঙ-মাখানো বিশ্রী চেহারা, ঝুঁটিবাঁধা কে একজন আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ার পিছনে দাঁড়াইল। তাহার নাম হিংসে]

পঞ্চম। ঠিক যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। না, ভাই?

চতুর্থ। হ্যাঁ, সত্যি হচ্ছে কি স্বপ্ন হচ্ছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয়। ও কে ভাই? ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে?

চতুর্থ, পঞ্চম। মাগো! কি বিচ্ছিরি চেহারা!

হিংসে। দেখ্ তো, আমায় চিনিস কিনা?

প্রথম। হ্যা, কোথায় দেখেছি মনে নেই, কিন্তু চেনা-চেনা লাগছে।

দ্বিতীয়। তুই কোথায় থাকিস ভাই?

হিংসে। তাও জানিসনে? এই তো তোদের মনের মধ্যেই থাকি।

প্রথম। মনের মধ্যে থাকে সে আবার কি রকম ভাই? সেখানে কি থাকবার জায়গা আছে?

হিংসে। হ্যাঁ, আছে বৈকি। ঘর বাগান জল মাটি আকাশ—সব আছে।

দ্বিতীয়। তাই নাকি? তোর নাম কি ভাই?

হিংসে। আমার নাম হিংসে—হিংসুটিদের মনের মধ্যে যে থাকে, সেই হিংসে—

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। হিংসে হাসি চিম্‌সে বাঁকা
কাল্‌কূট্‌কূট্ গরল মাখা।

দ্বিতীয়। কি সুন্দর কালো-কালো হাত দেখেছিস?

প্রথম। হ্যাঁ, আবার মুখে কি সুন্দর রঙ বেরঙের কাজ করেছে!

চতুর্থ। মাগো! ওকে আবার সুন্দর বলছে!

তৃতীয়, পঞ্চম। এমন কুচ্ছিত! ছ্যাঃ!

প্রথম। আচ্ছা ভাই, যারা হিংসুটি, তারা বুঝি খুব দুষ্টু?

হিংসে। হ্যাঁ, দুষ্টু বৈকি—দুষ্টু আর ঝগড়াটে—

প্রথম। কথায়-কথায় বুঝি রাগ করে?

হিংসে। হ্যাঁ, নিজেরা রাগ করে আর অন্যদের বলে হিংসুটি।

দ্বিতীয়। অন্যদের ভালো দেখতে পারে না, না?

হিংসে। একেবারেই পারে না। এমনিও পারে না—স্বপ্নেও পারে না।

প্রথম। ঠিক ঐ ওর মতো!

দ্বিতীয়। আচ্ছা ভাই, তুই হিংসুটিদের মধ্যে থাকিস কেন?

হিংসে। বাঃ! তা না হলে থাকব কোথায়? তোদের মনের মধ্যে, যেখানে কালো-কালো ঝুল-মাখানো পর্দা ঝোলে, সেখানে ছ্যাঁকছেঁকে আগুন জ্বেলে বসি—আর কাটা-কাটা ঝাল-ঝাল কথা বানিয়ে খাই। ভারি আরাম!

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। কি ভয়ানক দুষ্টু!

হিংসে। দেখলি! ওরা আমাকে দুষ্টু বলছে, বিশ্রী বলছে—তাই ওদের কাছে আমি একটুও ঘেঁষি না। আর তোরা আমায় লক্ষ্মী বলিস, মনের মধ্যে আদর করে পুষে রাখিস—তাই তোদের সঙ্গে আমার কত ভাব। আয় ভাই একটা গান গাই।

[হিংসে, প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়ের গান]

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন আমরা খাব মিস্‌রি।
আমরা পাব খেলনা পুতুল আমরা পাব চমচম,
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ পেলেও পাবে কম-কম।
আমরা শোব খাট-পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষটে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে।
আমরা যাব জামতাড়াতে চড়ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি সঙ্গে 'নে-যাও' বলব 'কলা এইনে।'
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন জুতোয় মচমচ,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছি-ছি হ্যাংলা নাকে ফঁচফঁচ।
আমরা পরি রেশমি জরি আমরা পরি গয়না,
তোমরা সে সব পাও না বলে তাও তোমাদের সয় না।
আমরা হব লাট মেজাজী তোমরা হবে কিপটে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধরব গলা চিপটে॥

প্রথম। দেখলি ভাই, কেমন মিষ্টি করে-করে কথা বলছে!

দ্বিতীয়। দেখলি! আমাদের কত ভালোবাসে, আর ওদের একটুও ভালোবাসে না।

হিংসে। তাহলে এখন আসি ভাই? মনে থাকবে তো? এই আমার ছাপ রেখে গেলাম।

[কালো-কালো আঙুল দিয়া দুইজনের গালে হিংসা কালো ছাপ

লাগাইয়া দিল। জাল গুটাইয়া লইয়া স্বপন বুড়ি চলিয়া গেল। আস্তে-আস্তে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

তৃতীয়। ওমা! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনেও নেই।

চতুর্থ। কি যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সেই হিংসে বলে একজন কে আছে—

পঞ্চম। কি আশ্চর্য! আমিও ঠিক তাই দেখেছি! ওদের সঙ্গে তার কত ভাব!

তৃতীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের মনের মধ্যে থাকে—

চতুর্থ। আর ঝাল-ঝাল কথা খায়—

প্রথম। ও কি ভাই! তোর গালে অমন দাগ দিয়ে গেল কে?

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। ও কি! সত্যি-সত্যি ছাপ দিয়ে গেছে যে!

[দ্বিতীয়ার দাগ মুছিবার চেষ্টা]

সকলে। কি দুষ্টু! কি দুষ্টু! কি দুষ্টু!

প্রথম। আবার বলে আমাদের সঙ্গে ভাব করবে!

দ্বিতীয়। কক্ষনো আর কোনোদিন ভাব করব না।

প্রথম। এমনিও করব না, স্বপ্নেও করব না।

সকলে। কক্ষনো না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।

চলচিত্ত-
চঞ্চরি

চলচিত্তচঞ্চরি

পাত্রগণ

১। সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার পাণ্ডাগণ

সত্যবাহন সমাদ্দার	...	চিন্তাশীল নেতা
ঈশান বাচস্পতি	...	কবি ও ভাবুক নেতা
সোমপ্রকাশ	...	উন্নতিশীল যুবক
জনার্দন	...	ঈশানের ধামাধারী
নিকুঞ্জ	...	সত্যবাহনের ধামাধারী

২। শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমচারীগণ

শ্রীখণ্ডদেব ... আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বেসর্বা

নবীন মাস্টার প্রভৃতি আশ্রমবাসী শিক্ষকগণ

রামপদ, বিনয়, সাধন প্রভৃতি ছাত্রগণ

৩। ভবদুলাল—আগন্তুক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[সাম্য-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ। ঈশানবাবু এক কোণে বসিয়া সঙ্গীত রচনায় ব্যস্ত। জনার্দন তাহার নিকটেই উপবিষ্ট। সোমপ্রকাশ খুব মোটামোটা দু-তিনটি কেতাব লইয়া তাহারই একটাকে মন দিয়া পড়িতেছে, এমন সময়ে মাল্য হস্তে নিকুঞ্জের প্রবেশ]

জনার্দন। আচ্ছা, শ্রীখণ্ডবাবুরা কেউ এলেন না কেন বলুন দেখি ?

নিকুঞ্জ। শুনলাম ঈশানবাবু নাকি ওঁদের কি ইন্সাল্ট করেছেন।

ঈশান। কি রকম! ইন্সাল্ট করলাম কি রকম ? একটা কথা বললেই হল ? এই জনার্দনবাবুই সাক্ষী আছেন—কোথায় ইন্সাল্ট হল তা উনিই বলুন।

জনার্দন। কই, তেমন তো কিছু বলা হয়নি—খালি স্বার্থপর মর্কট বলা হয়েছিল। তা ওঁরা যেমন অসহিষ্ণু ব্যবহার করছিলেন, তাতে ও রকম বলা কিছুই অন্যায় হয়নি।

সোমপ্রকাশ। আর যদি ইন্সাল্ট করেই থাকে তাতেই বা কি ? তার জন্যে কি এইটুকু সাম্যভাব ওঁদের থাকবে না যে, হৃদ্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন ?

ঈশান। তা তো বটেই। কিন্তু ঐ যে ওঁরা একটি দল পাকিয়েছেন, ওতেই ওঁদের সর্বনাশ করেছে।

জনার্দন। অন্তত আজকের মতো এই রকম একটা দিনেও কি ওঁরা দলাদলি ভুলতে পারেন না ?

সোমপ্রকাশ। যাই বলুন, এই সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য

দার্শনিক পণ্ডিত যা বলেছেন আমারও সেই মত। আমি বলি, ওঁরা না এসেছেন ভালোই হয়েছে।

[সত্যবাহনের শশব্যস্ত প্রবেশ]

সত্যবাহন। আসছেন, আসছেন, আপনারা প্রস্তুত থাকুন, এসে পড়লেন বলে। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা ঠিক আছে তো? নিকুঞ্জবাবু, আপনি সামনে আসুন। না, না, থাক, ঈশানবাবু আপনি একটু এগিয়ে যান।

ঈশান। আমি গেলে চলবে কেন? আমার গানটা আগে হয়ে যাক—

সত্যবাহন। না, না, ওসব গানটানে কাজ নেই—ওসব আজ থাক। আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে—আর বাড়িয়ে দরকার নেই।

ঈশান। বেশ তো! আপনার লেখাটাই যে পড়তেই হবে তার মানে কি? ওটাই থাকুক না কেন?

সত্যবাহন। আচ্ছা, তাহলে তাই হোক—আপনাদের গান আর বাজনাই চলুক। আমার লেখা যদি আপনাদের এতই বিরক্তিকর হয়, তা হলে দরকার কি? চল সোমপ্রকাশ, আমরা চলে যাই।

সকলে। না, না, সে কি, সে কি! তা কি হতে পারে?

সোমপ্রকাশ। (গদগদ) দেখুন, আমি মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছি, আজ আমাদের প্রাণে-প্রাণে দিকবিদিকে কত না আকুতি-বিকুতি অল্পে-অল্পে ধীরে-ধীরে—

জনার্দন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।

নিকুঞ্জ। ঐ এসে পড়েছেন।

সকলে। আসুন, আসুন, স্বাগতং, স্বাগতম্।

[ভবদুলালের প্রবেশ, অভ্যর্থনা ও সঙ্গীত]

গুণীজন-বন্দন লহ ফুল চন্দন—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন
আজি কি উদিল রবি পশ্চিম গগনে
জাগিল জগৎ আজি না জানি কি লগনে,
স্বাগত সঙ্গীত গুঞ্জন পবনে—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন।
আলা-ভোলা বাবাজীর চেলা তুমি শিষ্য
সৌম্য মুরতি তব অতি সুখদৃশ্য,
মজিয়া হরষরসে আজি গাহে বিশ্ব—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন।

সত্যবাহন। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা দাও তো।

সোমপ্রকাশ। আজ আমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে গোপনে-গোপনে—

সকলে। আহা-হা, খাতাখানা চাচ্ছেন, সেইটা আগে দাও।

সত্যবাহন। (খাতা লইয়া) আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন সেই চৈত্রমাসে আমরা আলাভোলা বাবাজীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওঃ, সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তা আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। দেখলাম মহা প্রশান্ত আলাভোলা বাবাজী হাস্যোজ্জ্বল মুখে পরম নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর পোষা চামচিকেটিকে

জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে বাবা-জীর প্রিয়শিষ্য—একি সোমপ্রকাশ, এ কোন খাতা নিয়ে এসেছ? ধুতি চারখানা, বিছানার চাদর একখানা, বালিশের ওয়াড় একখানা, বাকি একখানা তোয়ালে—এসব কি?

সোমপ্রকাশ। কেন? আপনিই তো আমার কাছে রাখতে দিলেন।

সত্যবাহন। বলি, একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে হয় তো, সাপ দিলাম না ব্যাঙ দিলাম?—দেখুন দেখি! এত কষ্ট করে রাত জেগে, সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখলাম, এখন নিয়ে এসেছে কিনা কার একটা ধোপার হিসেবের খাতা! এত যে বলি, নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে, তা কেউ শুনবে না!

ভবদুলাল। তা দেখুন, ওরকম ভুল অনেক সময় হয়ে যায়—করতে গেলাম এক, হয়ে গেল আর! আমার সেজোমামা একবার ঘিয়ের কারবার করে ফেল মেরেছিলেন—সেই থেকে কেউ গব্যঘৃত বললেই তিনি ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। আমি তো তা জানি না; মামাবাড়ি গিয়েছি, মহেশদা বললে, 'বল তো গব্যঘৃত।' আমি চেঁচিয়ে বললাম 'গ-ব্য-ঘৃ-ত'—অমনি দেখি সেজোমামা ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে মারতে এয়েছে! দেখুন তো কি অন্যায়! আমি তো ইচ্ছা করে ক্ষেপাইনি!

সত্যবাহন। যাক, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে,

বাইরের জিনিস যেমন মানুষের ভেতরে ধরা পড়ে, তেমনি ভেতরের জিনিসও সময়-সময় বাইরে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গভাবে যেসব জিনিস পাচ্ছি সেগুলোকে এখন বাইরে প্রকাশ করা দরকার।

ভবতুলাল। ঠিক বলেছেন। এই মনে করুন, যে কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটির রস খেয়ে বাড়ে, সেই কেঁচোই আবার মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে।

সকলে। (মহোৎসাহে) চমৎকার! চমৎকার!

নিকুঞ্জ। দেখেছেন, কেমন সুন্দরভাবে উনি কথাটা গুছিয়ে নিলেন!

ভবতুলাল। তা হলে সমাদ্দার মশাই, আপনি ঐ যেটা পড়বেন বলেছিলেন, আমায় সেটা দেবেন তো। আমি একখানা বড় বই লিখছি, তাতে ওটা ঢুকিয়ে দেব—

সোমপ্রকাশ। এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনি যদি এ কাজের ভার নেন, তাহলে আমাদের ভেতরকার ভাবগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলতে পারবেন।

জনার্দন। হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে।

ভবতুলাল। আর আপনার ঐ গানটিও আমায় শিখিয়ে দেবেন, ওটাও আমার বইয়ে ছাপতে চাই।

ঈশান। নিশ্চয়! নিশ্চয়! ওটা আমার নিজের লেখা। গান লেখা হচ্ছে আমার একটা বাতিক।

সোমপ্রকাশ। কি রকম আগ্রহ আর উৎসাহ দেখেছেন ওঁর?

ঈশান। তা তো হবেই। সকলের উৎসাহ কেন যে হয় না এই তো আশ্চর্য।

[ঈশানের সঙ্গীত]

এমন বিমর্ষ কেন?
মুখে নাই হর্ষ কেন?
কেন ভব-ভয়-ভীতি ভাবনা প্রভৃতি
বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?
(হায় হায় হায় বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?)

ভবদুলাল। (লিখিতে-লিখিতে) চমৎকার! এটা আমার বইয়ে দিতেই হবে। আমার কি মুশকিল জানেন? আমিও পৈট্রি লিখি, কিন্তু তার সুর বসাতে পারি না। এই তো এবার একটা লিখেছিলাম—

বলি ও হরি রামের খুড়ো
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।

মশায় কত রকম সুর লাগিয়ে দেখলাম—তার একটাও লাগল না। কি করা যায় বলুন তো?

ঈশান। ওর আর করবেন কি? ওটা ছেড়ে দিন না—

ভবদুলাল। তা অবিশ্যি, তবে টুইঙ্কল্, টুইঙ্কল্, লিটল্ স্টার— এই সুরটা অনেকটা লাগে—

[ভবদুলালের সঙ্গীত]

বলি ও হরিরামের খুড়ো—
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।
সর্দি কাশি হল্‌দি জ্বর
ভুগবি কত জল্‌দি মর।

কিন্তু এটাও ঠিক হয় না। ঐ যে 'মরবি রে মরবি' ঐ জায়গাটায় আরও জোর দেওয়া দরকার। কি বলেন?

ঈশান। হ্যাঁ, যে রকম গান—একটু জোরজার না করলে সহজে মরবে কেন?

সোমপ্রকাশ। (জনান্তিকে) কিন্তু শ্রীখণ্ডবাবুদের এ সমস্ত কাণ্ড প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

সত্যবাহন। উচিত সে তো আজ বছর ধরে শুনে আসছি। উচিত হয় তো বলে ফেললেই হয়? নিকুঞ্জবাবু কি বলেন?

নিকুঞ্জ। নিশ্চয়ই। কিসের কথা হচ্ছিল?

সত্যবাহন। ঐ শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের কথা। এবারে 'সত্যসন্ধিৎসা'য় কি লিখেছি পড়েননি বুঝি?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা চমৎকার হয়েছে। পড়ে দিন না— উনি শুনে সুখী হবেন।

সত্যবাহন। (পাঠ) এই যে অগণ্য গ্রহ-তারকা মণ্ডিত গগন-পথে ধরিত্রী ধাবমান, ভূধরকন্দর ভ্রাম্যমাণ—এই যে সাগরের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বর অভিমুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য নবোৎসাহে দিকদিগন্ত ধ্বনিত ঝংকৃত করিয়া,

কি যেন চায়, কি যেন চায়—প্রতিধ্বনি বলিতেছে সাম্য সমীক্ষপন্থা।

নিকুঞ্জ। শুনছেন? ভাষায় কেমন সতেজ অথচ—সহজ ভঙ্গী, সেটা লক্ষ্য করেছেন? ওর মধ্যে শ্রীখণ্ডবাবুদের উপর বেশ একটু কটাক্ষ রয়েছে।

জনার্দন। তাহলে আশ্রমের কথাটা আগে বলে নিন—নইলে উনি বুঝবেন কেমন করে।

ঈশান। সেইটিই তো আগে বলা উচিত। সোমপ্রকাশ তুমি বল তো হে—বেশ ভালো করে গুছিয়ে বল।

সত্যবাহন। আচ্ছা তা হলে সোমপ্রকাশই বলুক- (অভিমান)

সোমপ্রকাশ। কথাটা হয়েছে কি—এই যে ওঁরা একটা আশ্রম করেছেন, তার রকম-সকমগুলো যদি দেখেন—সর্বদাই কেমন একটা—অর্থাৎ, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—কি শিক্ষার দিক দিয়ে, কি অন্যদিক দিয়ে, যেমন ভাবেই দেখুন—আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো? যেমন, ইয়ের কথাটাই ধরুন না কেন—মানে সব কথা তো আর মুখস্থ করে রাখিনি!

ভবদুলাল। তা তো বটেই, এ তো আর একজামিন দিতে আসেননি।

নিকুঞ্জ। সমাদ্দার মশাইকে বলতে দাও না।

সত্যবাহন। না, না, আমায় কেন? আমি কি আপনাদের মতো তেমন গুছিয়ে ভালো করে বলতে পারি?

সকলে। কেন পারবেন না? খুব পারবেন।

সত্যবাহন। আর মশাই, ওসব ছোট কথা—কে কি বলল আর কে কি করল! ওর মধ্যে আমায় কেন?

জনার্দন। আচ্ছা, তাহলে আর কেউ বলুন না।

সত্যবাহন। কি আপদ! আমি কি বলব না বলছি? তবে, কি রকম ভাব থেকে বলছি সেটা তো একবার জানানো উচিত, তা নয় তো শেষকালে আপনারাই বলবেন সত্যবাহন সমাদ্দার পরনিন্দা করচে।

জনার্দন। হ্যাঁ, শুধু বললেই তো হল না, দশদিক বিবেচনা করে বলতে হবে তো?

সত্যবাহন। আমার হয়েছে কি, ছেলেবেলা থেকেই কেমন অভ্যাস—পরনিন্দা পরচর্চা এসব আমি আদবে সইতে পারি না।

জনার্দন। আমারও ঠিক তাই। ওসব একেবারে সইতে পারি না।

সোমপ্রকাশ। পরনিন্দা তো দূরের কথা, নিজের নিন্দাও সহ্য হয় না।

সত্যবাহন। কিন্তু তা বলে সত্য কি আর গোপন রাখা যায়?

ভবতুলাল। গোপন করলে আরো খারাপ। ছেলেবেলায় একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে 'কু' করে শব্দ করেছিল। মাস্টার বললেন, 'কে করল, কে করল?' আমি

ভাবলাম আমার অত বলতে যাবার দরকার কি। শেষটায় দেখি, আমাকেই ধরে মারতে লেগেছে। দেখুন দেখি! ওসব কক্ষনো গোপন করতে নেই।

জনার্দন। আমাদেরও তাই হয়েছে। কিছু বলি না বলে দিন-দিন ওরা যেন আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে।

নিকুঞ্জ। আশ্রমের ছেলেগুলো পর্যন্ত যেন কি এক রকম হয়ে উঠেছে।

জনার্দন। হ্যাঁ, ঐ রামপদটা সেদিন সমাদ্দার মশাইকে কি না বললে।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ কথাটা একবার বলুন দেখি, তাহলে বুঝবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

জনার্দন। হ্যাঁ, বুঝলেন? ছোকরার এতবড় আস্পর্ধা সমাদ্দার মশাইকে মুখের উপর বলে কি যে—হ্যাঁ, কি-না বললে!

নিকুঞ্জ। কি যেন—সেই খুলনার মকদ্দমার কথা নয় তো?

জনার্দন। আরে না, ঐ যে পিলসুজের বাতি নিয়ে কি একটা কথা।

সোমপ্রকাশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে কি একটা সংস্কৃত কথা তার দু-তিন রকম মানে হয়।

নিকুঞ্জ। ওঁরই কি একটা কথা ওঁরই উপর খাটাতে গিয়েছিল। মোটকথা, তার ও-রকম বলা একেবারেই উচিত হয়নি।

ভবদুলাল। কি আপদ! তা আপনারা এসব সহ্য করেন কেন?

সত্যবাহন। সহ্য না করেই বা করি কি? কিছু কি বলবার

যো আছে? এই তো সেদিন একটা ছোকরাকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললাম—'বাপু হে, ও-রকম বাঁদরের মতো ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বলি কেবল এয়ারকি করলে তো চলবে না! কর্তব্য বলে যে জিনিস আছে সেটা কি ভুলেও এক-আধবার ভাবতে নেই? এদিকে নিজের মাথাটি যে খেয়ে বসেছ!'—মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, এতেই সে একেবারে গজগজিয়ে উঠে আমার কথাগুলো না শুনেই হনহন করে চলে গেল!

সোমপ্রকাশ। এই তো দেখুন না, এখানে সকলে সাধু সঙ্গে বসে কত সৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে শুনলেও উপকার হয়। তা, ওরা কেউ ভুলেও একবার এদিকে আসুক দেখি, তা আসবে না।

জনার্দন। তা আসবে কেন? যদি দৈবাৎ ভালো কথা কানে ঢুকে যায়!

সত্যবাহন। আসল কথা কি জানেন? এসব হচ্ছে শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত। এই যে শ্রীখণ্ডদেব, লোকটি একটু বেশ অহং ভাবাপন্ন। এই তো দেখুন না, আমাদের এখানে আমি-আছি, এঁরা আছেন, তা মাঝে-মাঝে আমাদের পরামর্শ নিলেই—

[রামপদর প্রবেশ]

সত্যবাহন। এই দেখুন এক মূর্তিমান এসে হাজির।

নিকুঞ্জ। আরে দেখছিস আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে আসবার কি দরকার বাপু?

জনার্দন। বলি, একি বাঁদর নাচ—সঙের খেলা, যে তামাশা দেখতে এয়েছ ?

রামপদ। (স্বগত) কি আপদ! তখনি বলেছি, আমায় ওখানে পাঠাবেন না—

নিকুঞ্জ। কি হে, তুমি সমাদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে বেয়াদবি কর—এই রকম তোমাদের আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

রামপদ। আমি ? কই আমি তো—আমার তো মনে পড়ে না, আমি—

সত্যবাহন। আমি, আমি, আমি—কেবল আমি! আমি, আমি, এত আত্মপ্রচার কেন ? আর কি বলবার বিষয় নেই ?

ঈশান। 'আত্মম্ভরী অহঙ্কার আত্মনামে হুহুঙ্কার তার গতি হবে না হবে না—'

সোমপ্রকাশ। দেখ, ও-রকমটা ভালো নয়—নিজের কথা দশজনের কাছে বলে বেড়াব, এ ইচ্ছাটাই ভালো নয়।

সত্যবাহন। আমি যখন খুলনায় চাকরি করতাম, ফাউসন সাহেব নিজে আমায় সার্টিফিকেট দিলে—'বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে উৎসাহে, চরিত্রে সাধুতায়, সেকেণ্ড টু ন্যন্ !!' কারুর চাইতে কম নয়। আমি কি সে কথা তোমায় বলতে গিয়েছিলাম ?

নিকুঞ্জ। আমার পিসতুতো ভাই সেবার লাট সাহেবের সামনে গান করলে আমি কি তা নিয়ে ঢাক পিটিয়েছিলাম ?

ঈশান। আমার তিন ভল্যুম ইংরাজী কাব্য 'ইন্ মেমোরিয়াম' 'ও মান্ধাতা!' 'ও মোরস্!' যেবার বেরুল সেবার 'বেঙ্গলী'-তে কি লিখেছিল জানেন তো? 'উই কনগ্র্যাচুলেট দি ডিস্টিঙ্গুইসড অথার অফ দিস মনুমেন্টাল প্রোডাকশান (ডাব্ল ডিমাই অক্টেভো ৯৭৪ পেজেস) হু ইজ এভিডেন্টলি ইন পোজেশান অভ এ স্টুপেন্ডাস এ্যামাউন্ট অভ এ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশান!' এঁরা যদি কথাটা না তুলতেন, আমি কি গায়ে পড়ে গল্প করতে যেতুম?

রামপদ। কি জানি মশাই, আমায় শ্রীনগুরা পাঠিয়ে দিলেন —তাই বলতে এলুম।

সত্যবাহন। দেখ তর্ক করো না—তর্ক করে কেউ কোনোদিন মানুষ হতে পারেনি।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, ওটা তোমাদের ভারি একটা বদভ্যাস। আজ পর্যন্ত তর্ক করে কোনো বড় কাজ হয়েছে এরকম কোথাও শুনেছ?

ঈশান। এই যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাতে করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রকে চালাচ্ছে, সে কি তর্ক করে চালাচ্ছে?

সোমপ্রকাশ। আমি দেখছি এ বিষয়ে বড়-বড় পণ্ডিতের সকলেরই একমত।

সত্যবাহন। আমার সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধি কা বইখানাতে একথা বার-বার করে দেখিয়েছি যে তর্ক করে কিছু হবার যো নেই। মনে করুন যেন তর্ক হচ্ছে যে, আফ্রিকা দেশে সেন্ট-হেল

পাওয়া যায় কি না। মনে করুন যদি সত্যি করে সে ফল থাকে, তবে আপনি বলবার আগেও সে ছিল বলবার পরেও সে থাকবে। আর যদি সে ফল না থাকে, তবে আপনি হ্যাঁ বললেও নেই, না বললেও নেই। তবে তর্ক করে লাভটা কি?

ভবতুলাল। তা তো বটেই—ফোড়া যদি পাকবার হয় তাকে আদুড় করেই রাখ—আর পুলটিশ দিয়েই ঢাক, সে টনটনিয়ে উঠবেই।

নিকুঞ্জ। আরে মশাই এ সব বলিই বা কাকে—আর বললে শোনেই বা কে!

সোমপ্রকাশ। শুনলেই বা বোঝে কয়জন আর বুঝলেই বা ধরতে পারে কয়জন? ঐ ধরাটাই আসল কিনা।

[ঈশানের সঙ্গীত]

ধরি ধরি ধর ধর ধরি কিন্তু ধরে কই?
কারে ধরি কেবা ধরে ধরাধরি করে কই?
ধরনে ধাবণে তারে ধরণী ধরিতে নারে
আঁধার ধারণা মাঝে সে ধারা শিহরে কই?

জনার্দন। কথাটা বড় খাঁটি। এই যে আমাদের সমীক্ষা-চক্র আর সমসাম্য-সাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ড ভাব, এ সমস্ত ধরেই বা কে, আর ধরতে জানেই বা কে?

সত্যবাহন। ধরা না হয় দূরের কথা, ও-বিষয়ে ভালো-ভালো বই যে দু-একখানা আছে, সেগুলো পড়া উচিত। আমি

বেশি কিছু বলছি না—অন্তত আমার সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা, এ দুখানা পড়তে পারে তো!

ভবদুলাল। তাহলে তো পড়ে দেখতে হচ্ছে। কি নাম বললেন বইটার?

সত্যবাহন। সাম্য-নির্ঘণ্ট, তিন-টাকা দু-আনা, আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তিন ভল্যুম, খণ্ড-সিদ্ধান্ত অখণ্ড-সিদ্ধান্ত আর খণ্ডাখণ্ড-সিদ্ধান্ত—সাত-টাকা চার-আনা। দুখানা বই এক সঙ্গে নিলে সাড়ে-নয়-টাকা, প্যাকিং চার-পয়সা, ডাকমাশুল সাড়ে-পাঁচ-আনা, এই সবসুদ্ধ ন-টাকা চোদ্দ-আনা।

ভবদুলাল। তা এটা আপনার কোন এডিশান বললেন?

ঈশান। আঃ—ফাস্ট এডিশান মশাই, ফাস্ট এডিশান—এই তো সবে সাত বছর হল, এর মধ্যেই কি?

সত্যবাহন। তা আমি তো আর অন্যদের মতো বিজ্ঞাপনের চটক দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটাই না।

ঈশান। হ্যাঁ, উনি তো আর নিজে পেটান না—ওঁর পেটাবার লোক আছে। তা ছাড়া এই কাগজওয়ালাগুলো এমন হতভাগা, কেউ ওঁর বইয়ের সুখ্যাত করতে চায় না।

সত্যবাহন। কেন, সচ্চিন্তা-সন্দীপিকায় বেশ লিখেছিল।

ঈশান। ও হ্যাঁ, আপনার মেজোমামা লিখেছিলেন বুঝি?

সত্যবাহন। মেজোমামা নয়, সেজোমামা। কি হে, তোমার এখানে হাঁ করে সব কথা শুনবার দরকার কি বাপু?

[রামপদর প্রস্থান]

ভবতুলাল। আচ্ছা, ঐ যে খণ্ডাখণ্ড কি সব বলছিলেন, ওগুলোর আসল ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা উনি বেশ বুঝিয়ে দিন। এ-বিষয়ে উনিই হচ্ছেন অথরিটি।

সত্যবাহন। ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে যাকে বলে পৃথগ্ দর্শন। যেমন কুকুরটা ঘোড়া নয়, ঘোড়াটা গরু নয়, গরুটা মানুষ নয়—এই রকম। এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড খণ্ড—এই সাধারণ ইতর লোকে যেমন মনে করে।

ভবতুলাল। (স্বগত) দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বলছে সাধারণ ইতর লোক!

সত্যবাহন। আর অখণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যাকে আমরা বলি 'কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং' অর্থাৎ এই যে নানারকম সব দেখছি এ কেবল দেখবার রকমারি কিনা! আসলে বস্তু হিসাবে ঘোড়াও যা গরুও তা—কারণ বস্তু তো আর স্বতন্ত্র নয়—মূলে কেন্দ্রগতভাবে সমস্তই এক অখণ্ড—বুঝলেন না?

ভবতুলাল। হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং—এই তো?

সত্যবাহন। হ্যাঁ, বস্তুমাত্রেই হচ্ছে তার কেন্দ্রগত কতকগুলি গুণের সমষ্টি। মনে করুন ঘোড়া আর গরু—এদের গুণগুলি সব মিলিয়ে-মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন। ঘোড়া চতুষ্পদ, গরু

চতুষ্পদ, ঘোড়া পোষ মানে, গরু পোষ মানে—সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড হিসাবে কোনো তফাত নেই, এখানে ঘোড়াও যা গরুও তা। আবার দেখুন, ঘোড়াও ঘাস খায় গরুও ঘাস খায়—এও বেশ মিলে যাচ্ছে, কেমন?

ভবদুলাল। কিন্তু ঘোড়ার তো শিঙ নেই, গরুর শিঙ আছে—তা হলে সেখান দিয়ে মিলবে কি করে?

সত্যবাহন। সেখানে গাধার সঙ্গে মিলবে। এমনি করে সব পদার্থের সব গুণ নিয়ে যদি কাটাকাটি করা যায় তবে দেখবেন খণ্ড ফ্র্যাকশন সব কেটে গিয়ে বাকি থাকবে—এক। তাকেই বলি আমরা অখণ্ডতত্ত্ব।

ভবদুলাল। এইবারে বুঝেছি। এই যেমন তাশে তাশে জোড় মিলিয়ে সব গেল কেটে বাকি রইল—গোলামচোর।

সত্যবাহন। কিন্তু সাধন করলে দেখা যায়, এর উপরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে সমসাম্যভাব, অর্থাৎ খণ্ডাখণ্ড মীমাংসা। এ অবস্থায় উঠতে পারলে তখন ঠিকমতো সমীক্ষা সাধন আরম্ভ হয়।

ভবদুলাল। 'সমীক্ষা' আবার কি?

সত্যবাহন। সাধনের স্তরে উঠে যেটা পাওয়া, তাকে বলে সমীক্ষা—সেটা কি রকম জানেন?

ভবদুলাল। থাক, আজ আর নয়। আমার আবার কেমন মাথার ব্যারাম আছে।

সত্যবাহন। না, আমি ওর ভেতরকার জটিল তত্ত্বগুলো কিছু

বলছি না, খালি গোড়ার কথাটা একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ এটুকু তলিয়ে দেখবেন যে ঘোড়াটা যে অর্থে ঘাস খাচ্ছে গরুটা ঠিক সে অর্থে ঘাস খাচ্ছে কিনা—

ভবদুলাল। তা কি করে খাবে? এ হল ঘোড়া, ও হল গরু—তবে দুজনের যদি একই মালিক হয়, তবে এ-ও মালিকের অর্থে খাচ্চে, ও-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে—

সত্যবাহন। না, না—আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেননি।

ভবদুলাল। ও—তা হবে। আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। আজকে তাহলে উঠি। অনেক ভালো-ভালো কথা শোনা গেল— বই লেখবার সময় কাজে লাগবে।

ঈশান। ওঁকে একখানা নোটিস দিয়েছেন তো?

জনার্দন। ও, না। এই একখানা নোটিস নিয়ে যান ভবদুলাল-বাবু। আজ অমাবস্যা, সন্ধ্যার সময় আমাদের সমীক্ষা-চক্র বসবে।

সোমপ্রকাশ। আজ ঈশানবাবু চক্রাচার্য—ওঃ! ওঁর ইয়ে শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।

ঈশান। এই তত্ত্ব-টত্ত্ব যে সব শুনলেন ওগুলো হচ্ছে বাইরের কথা। আসল ভেতরের জিনিস যদি কিছু পেতে চান তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমীক্ষা-সাধন।

[সকলের প্রস্থান]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সমীক্ষা মন্দির। অন্ধকার ঘরের মাঝখানে লাল বাতি, ধূপধুনা ইত্যাদি। কপালে চন্দন মাখিয়া ঈশান উপবিষ্ট, তার পাশে একদিকে সোমপ্রকাশ ও জনার্দন, অপর দিকে নিকুঞ্জ ও দুটি শূন্য আসন।]

[ঈশানের সঙ্গীত ও তৎসঙ্গে সকলের যোগদান]

ঈশান। দেখতে-দেখতে সব যেন নিস্তেজ হয়ে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল। বোধ হল যেন ভেতরকার খণ্ড-খণ্ড ভাবগুলো সব আলগা হয়ে যাচ্ছে। যেন চারদিকে কি একটা কাণ্ড হচ্ছে, সেটা ভেতরে হচ্ছে কি বাইরে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে, ঝাপসা ছায়ার মতো কে যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। ঘুরছে-ঘুরছে আর মনের বাঁধন সব খুলে আসছে।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

ভবদুলাল। (সশব্দে খাতা ফেলিয়া মুখ মুছিতে-মুছিতে) বাস রে! কি গরম!

সকলে। স্-স্-স্-স্—

ভবদুলাল। এখন সেই মক্ষিকা চক্র হবে বুঝি?

নিকুঞ্জ। এখন কথা বলবেন না—স্থির হয়ে বসুন।

সোমপ্রকাশ। মক্ষিকা নয়—সমীক্ষা।

ঈশান। অনেকক্ষণ চেয়ে তারপর ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'কে?' শুনলাম আমার বুকের ভিতর থেকে ক্ষীণ সরু গলায় কে

যেন বললে 'আমি।' বোধ হল যেন ছায়াটা চলতে-চলতে থেমে গেল। তখন সাহস করে আবার বললাম 'কে?' অমনি 'কে কে কে' বলে কাপতে-কাঁপতে কাঁপতে-কাঁপতে কে যেন পর্দার মতো সরে গেল—চেয়ে দেখলাম, আমিই সেই ছায়া, ঘুরছি-ঘুরছি আর বাঁধন খুলছে!

জনার্দন। মনের লাটাই ঘুরছে আর সুতো খুলছে, আর আত্মা-ঘুড়ি উধাও হয়ে শূন্যে উড়ে গোঁৎ খাচ্ছে!

ঈশান। কালের স্রোতে উজান ঠেলে ঘুরতে-ঘুরতে চলছি আর দেখছি যেন কাছের জিনিস সব ঝাপসা হয়ে সরে যাচ্ছে, আর দূরের জিনিসগুলো অন্ধকার করে ঘিরে আসছে। ভূত, ভবিষ্যৎ সব তাল পাকিয়ে জমে উঠেছে আর চারদিক হতে একটা বিরাট অন্ধকার হা করে আমায় গিলতে আসছে। মনে হল একটা প্রকাণ্ড জঠরের মধ্যে অন্ধকারের জারক-রসে অল্পে-অল্পে আমায় জার্ণ করে ফেলছে আর সৃষ্টি প্রপঞ্চের শিরায় আমি অল্পে-অল্পে ছড়িয়ে পড়ছি। অন্ধকার যতই জমাট হয়ে উঠছে, ততই আমায় আস্তে-আস্তে ঠেলছে আর বলছে, 'আছ নাকি, আছ নাকি?' আমি প্রাণপণে চিৎকার করে বললাম, 'আছি।' কিন্তু কোনো আওয়াজ হল না—খালি মনে হল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা নিশ্বাসের মতো উঠছে আর পড়ছে।

ভবদুলাল। উঃ! বলেন কি মশাই?

ঈশান। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, কোনো স্থল নেই,

বস্তু নেই—খালি একটা অন্ধপ্রাণের ঘূর্ণি ঝড়ের বাঁধন ঠেলে ঠেলে বুদ্‌বুদের মতো চারদিকে ফুলে উঠছে। দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসেব মিলছে না। অন্ধকারের ভাঁজে-ভাঁজে পঞ্চতন্মাত্রা সাজানো থাকে, এক জায়গায় তার কাঁচা মসলাগুলো ভূতশুদ্ধি না হতেই হুড়হুড় করে স্থূল-পিণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বলতে গেলুম 'সর্বনাশ! সর্বনাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়েছে—' কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকেই বেরোল না। বেরোল খালি হা-হা-হা-হা একটা বিকট হাসির শব্দ। সেই শব্দে আমার সমীক্ষা-বন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম-ঝিম করতে লাগল।

ভবদুলাল। আপনি চলে আসবার পর আমি দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না, আর গুমরে-গুমরে ফেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস-ফিস করে বলছে—'শেক দি বট্‌ল্, শেক দি বট্‌ল্!'—সত্যি!

ঈশান। কি মশাই আবোল তাবোল বকছেন!

সোমপ্রকাশ। দেখুন, এসব বিষয়ে ফস করে কিছু বলতে নেই—আগে ভিতরে-ভিতরে ধারণা সঞ্চয় করতে হয়।

জনার্দন। হ্যাঁ, সব জিনিসে কি আর মেকি চলে?

ভবদুলাল। ও, ঠিক হয়নি বুঝি? তা আমার তো অভ্যেস নেই—তার উপর ছেলেবেলা থেকেই কেমন মাথা খারাপ। সেই একবার পাগলা বেড়ালে কামড়েছিল, সেই থেকে ঐ

রকম। সে কি রকম হল জানেন? আমার মেজোমামা, যিনি ভাগলপুরে চাকরি করেন, তাঁর ঐ পশ্চিমের ঘরটায় টেঁপি, টেঁপির বাপ, টেঁপির মামা, মনোহর চাটুয্যে—না, মনোহর চাটুয্যে নয়—মহেশ দা, ভোলা—

ঈশান। তাহলে ঐ চলুক, আমি এখন উঠি।

ভবতুলাল। শুনুন না—সবাই বসে-বসে গল্প করছে এমন সময়ে আমরা ধর-ধর-ধর-ধর বলে বেড়ালটাকে তাড়া করে ঘরের মধ্যে নিতেই বেড়ালটা এক লাফে জানলার উপর যেই না উঠেছে, অমনি আমি দৌড়ে গিয়ে খপ করে ধরেছি তার ল্যাজে—আর বেড়ালটা ফ্যাস করে আমার হাতের উপর কামড়ে দিয়েছে।

[ঈশানের প্রস্থানোদ্দম]

ভবতুলাল। এই একটু শুনে যান—গল্পটা ভারি মজার।

ঈশান। দেখুন, এটা হাসবার এবং গল্প করবার জায়গা নয়।

ভবতুলাল। তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন।

ঈশান। গল্প কি মশাই? সমীক্ষা কি গল্প হল?

জনার্দন। কাকে কি বলে তাই জানেন না, কেন তর্ক করেন মিছিমিছি?

ভবতুলাল। না, না, তর্ক করব কেন? দেখুন তর্ক করে কিছু হবার যো নেই। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এ যে তর্ক করে

সব চালাচ্ছে, সে কি ভালো করছে? আমি তর্কের জন্য বলিনি।

সত্যবাহন। দেখুন, এ আপনাদের ভারি অন্যায়। ভুলচুক কি আর আপনাদের হয় না? অমনি করলে মানুষের শিখবার আগ্রহ থাকবে কেন?

[আশ্রমের ছাত্র বিনয়সাধনের প্রবেশ]

ঈশান। ঐ দেখ, আবার একটি এসে হাজির। তুমি কে হে?

বিনয়সাধন। আমি? হ্যাঃ, আমার কথা কেন বলেন? আমি আবার একটা মানুষ! হ্যাঃ, কি যে বলেন?

ঈশান। বলি, এখানে এয়েছ কি করতে?

সত্যবাহন। কি নাম তোমার?

বিনয়সাধন। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবিনয়সাধন। (পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া) ভবদুলালবাবু কার নাম?

সত্যবাহন। কেন হে, বেয়াদব? সে খবরে তোমার দরকার কি?

নিকুঞ্জ। এ কি এয়ার্কি পেয়েছ? তোমার বাপ-ঠাকুর্দার বয়সী ভদ্রলোক সব—ছি, ছি, ছি!

জনার্দন। কি আস্পর্ধা দেখুন তো!

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ—কার বাপের নাম কি, শ্বশুরের বয়েস কত, ওর কাছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে!

সত্যবাহন। এঁরই নাম ভবদুলালবাবু। এখন কি বলতে চাও এঁর বিরুদ্ধে বল।

বিনয়সাধন। না, না, বিরুদ্ধে বলব কেন?

সত্যবাহন। কাপুরুষ! এইটুকু সৎসাহস নেই—আবার আস্ফালন করতে এসেছ?

বিনয়সাধন। আহা, আমার কথাটাই আগে বলতে দিন—

সত্যবাহন। শুনলেন ভবদুলালবাবু? ওর কথাটা আগে বলতে দিতে হবে। আমাদের কথাগুলোর কোনোই মূল্য নেই।

নিকুঞ্জ। দশজনে যা শুনবার জন্যে কত আগ্রহ করে আসে, এঁরা সে-সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

সোমপ্রকাশ। এইজন্য সাধকেরা বলেন যে মানুষের ভূয়োদর্শনের অভাব হলে মানুষ সব করতে পারে।

বিনয়সাধন। কি আপদ! মশায় চিঠিখানা দিতে এসেছিলুম তাই দিয়ে যাচ্ছি—এই নিন। আচ্ছা ঝকমারি যা হোক!

[বিনয়সাধনের দ্রুত প্রস্থান]

সোমপ্রকাশ। মানুষের মনের গতি কি আশ্চর্য! একদিকে হেরিডিটি আর একদিকে এনভাইয়ারনমেণ্ট—এই দুয়ের প্রভাব এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

ভবদুলাল। (পত্র পাঠ করিয়া) শ্রীখণ্ডবাবু আমাকে কাল ওখানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঈশান। কি! এত বড় আস্পর্ধা! আবার নিমন্ত্রণ করতে সাহস পান কোন মুখে?

সত্যবাহন। না, যাব না আমরা। সত্যবাহন সমাদ্দার ওসব লোকের সম্পর্ক রাখে না।

ভবদুলাল। উনি লিখছেন, 'কাল ছুটির দিন, আপনার সঙ্গে

নিরিবিলি বসিয়া কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা আছে।'

ঈশান। ঐ দেখেছেন? 'নিরিবিলি বসিয়া'। কেন বাপু, আমরা এক-আধজন ভদ্রলোক থাকলে তোমার আপত্তিটা কি?

জনার্দন। এর থেকেই বোঝা উচিত যে ওঁর মতলবটা ভালো নয়!

নিকুঞ্জ। ঠিক বলেছেন। মতলব যদি ভালোই হবে, তবে এত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কেন? নিরিবিলি বসতে চান কেন?

সোমপ্রকাশ। বুঝলেন ভবদুলালবাবু, আপনি ওখানে যাবেন না। গেলেই বিপদে পড়বেন।

ভবদুলাল। বল কিহে? ছুরিছোরা মারবে নাকি?

সোমপ্রকাশ। না, না, বিপদটা কি জানেন? চিন্তাশীল লোকেরা বলেন যে, বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোনো অবাস্তর স্বরূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়।

ভবদুলাল। (পুলকিত ভাবে) এ আবার কি বলে শুনুন।

সোমপ্রকাশ। স্বয়ং হার্বার্ট স্পেন্সার একথা বলেছেন। আপনি হার্বার্ট স্পেন্সারকে জানেন তো?

ভবদুলাল। হ্যাঁ···হার্বার্ট, স্পেন্সার, হাঁচি, টিকটিকি, ভূত, প্রেত সব মানি।

সত্যবাহন। আপনি ভাববেন না ভবদুলালবাবু, আপনার কোনো ভয় নেই। আমি আপনার সঙ্গে যাব, দেখি ওরা কি করতে পারে।

নিকুঞ্জ। ব্যস, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঈশান। সেই জুবিলির বছর কি হয়েছিল মনে নেই? শ্রীখণ্ড-বাবু ওঁদের ওখানে এক বক্তৃতা দিলেন, আমরা দল বেঁধে শুনতে গেলাম। গিয়ে শুনি, তার আগাগোড়াই কেবল নিজেদের কথা। ওঁদের আশ্রম, ওঁদের সাধন, ওঁদের যত সব ছাইভস্ম, তাই খুব ফলাও করে বলতে লাগলেন।

সত্যবাহন। শেষটায় আমি বাধ্য হয়ে উঠে তেজের সঙ্গে বললাম, 'লালাজি দেওনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে অখণ্ড-সাধন-ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তা যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সে হচ্ছে আমাদের সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।'

ঈশান। ওঁরা সে সব ভেঙে চুরে এখন বিজ্ঞানের আগড়ুম-বাগড়ুম করছেন। আরে বিজ্ঞান-বিজ্ঞান বললেই কি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়!

নিকুঞ্জ। বেশি দূর যাবার দরকার কি? ওঁরা কি রকম সব ছেলে তৈরি করছেন তাও দেখুন, আর আমাদের সোম-প্রকাশকেও দেখুন।

জনার্দন। একটা আদর্শ ছেলে বললেই হয়।

সোমপ্রকাশ। না, না, ছি-ছি-ছি, কি বলছেন! আমি এই যেমন লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সুয়েজ প্রণালী, আমায় সেই রকম মনে করবেন।

জনার্দন। আসল কথা হচ্ছে, আমরা এখন সাধনের যে স্তরে উঠেছি, ওঁরা সে পর্যন্ত ধারণা করতেই পারেননি।

নিকুঞ্জ। ওঃ! গতবারে যদি আপনি থাকতেন! ঈক্ষা আর সমীক্ষা সম্বন্ধে সমাদ্দার মশাই যা বললেন শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ঈশান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঁটা দিয়ে তো উঠত, কিন্তু এখন দুপুর রাত পর্যন্ত আপনাদের ঐ আলোচনাই চলবে নাকি!

[সকলের গাত্রোত্থান]

সত্যবাহন। তাহলে এই কথা রইল, কাল আপনার বাড়ি হয়ে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম। ছাত্রেরা সেমিসার্কল হইয়া দণ্ডায়মান। শিক্ষক নবীনবাবু প্রভৃতি ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। শ্রীখণ্ডদেব ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর বড়-বড় বই সাজাইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। একপাশে কতকগুলি অদ্ভুত যন্ত্র ও অর্থহীন চার্ট প্রভৃতি। দেয়ালে কতকগুলি কার্ডে নানারকম মটো লেখা রহিয়াছে।]

নবীন। (জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া) এই মাটি করেছে! সঙ্গে-সঙ্গে সত্যবাহন সমাদ্দারও আসছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড। আসুক, আসুক। একবার চোখ মেলে সব দেখে যাক। তারপর দেখি, ওর কথা বলবার মুখ থাকে কিনা।

নবীন। এসে একটা গোলমাল না বাধালেই হয়।

শ্রীখণ্ড। তা যদি করে তাহলে দেখিয়ে দেব যে শ্রীখণ্ড লোকটিও বড় কম গোলমেলে নয়।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

সত্যবাহন। এই যে, ছেলেগুলো সব হাজির রয়েছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড। না, সব আর কোথায়? ছুটিতে অনেকেই বাড়ি গিয়েছে।

সত্যবাহন। খালি খুব খারাপ ছেলেগুলো রয়ে গেছে বুঝি?

শ্রীখণ্ড। খারাপ ছেলে আবার কি মশায়? মানুষ আবার খারাপ কি? খারাপ কেউ নয়। ঘোর অসাম্য বদ্ধ পাষণ্ড যে তাকেও আমরা খারাপ বলি না।

ভবদুলাল। তা তো বটেই। ও-সব বলতে নেই। আমি একবার আমাদের গোবরা মাতালকে খারাপ লোক বলেছিলাম, সে এত বড় একটা থান ইট নিয়ে আমায় মারতে এসেছিল। ওরকম কক্ষনো বলবেন না।

সত্যবাহন। সে কি মশায়! যে খারাপ তাকে খারাপ বলব না? আলবৎ বলব। খারাপ ছেলে!

শ্রীখণ্ড। আহা-হা, উনি আশ্রমের শিক্ষক—নবীনবাবু।

সত্যবাহন। ও, তাই নাকি? যাই হোক, তুমি কি পড়েছ ছোকরা?

ছাত্র। শব্দার্থ-খণ্ডিকা, আয়স্কন্ধ-পদ্ধতি, লোকাষ্টপ্রকরণ,

সিম্লেক্স্ কস্মোপোডিয়া, পালস এক্সট্রা সাইক্লিক ইকুইলি-ব্রিয়াম এ্যাণ্ড দি নেগেটিভ জিরো—

সত্যবাহন। থাক, থাক, আর বলতে হবে না! দেখুন, অত বেশি পড়িয়ে কিছু লাভ হয় না। আমি দেখেছি ভালো বই খান-তুই হলেই এদিককার শিক্ষা সব একরকম হয়ে যায়।

ভবদুলাল। আমার 'চলচিত্তচঞ্চরি' বইখানা আপনাদের লাইব্রেরিতে রাখেন না কেন?

শ্রীখণ্ড। বেশ তো, দিন না এক কপি।

ভবদুলাল। আচ্ছা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কি, বইটা এখনো বেরোয়নি। মানে খুব বড় বই হচ্ছে কিনা, অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন তো?

শ্রীখণ্ড। ও, এখনো ছাপতে দেননি বুঝি?

ভবদুলাল। না, এই লেখা হলেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখতে হবে তো? সেটা কি রকম লিখব তাই ভাবছি। খুব বড় বই হবে কিনা!

শ্রীখণ্ড। কি নাম বললেন বইখানার?

ভবদুলাল। কি নাম বললাম? চলচঞ্চল, কি না? দেখুন তো মশাই, সব ঘুলিয়ে দিলেন—এমন সুন্দর নামটা ভেবেছিলাম।

সত্যবাহন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল বাজারে দুখানা বই বেরিয়েছে—সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-

বিশুদ্ধিকা—তাতে শিক্ষাতত্ত্ব আর সাধনতত্ত্ব এই দুটো দিকই সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীখণ্ড। ঐ তো—ও বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। আমরা বলি—অখণ্ড শিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে তার মধ্যে বেশ একটা সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য থাকবে—যেমন নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস।

সত্যবাহন। ঐ করেই তো আপনারা গেলেন। এদিকে ছেলেগুলোর শাসন-টাসনের দিকে আপনাদের এক ফোঁটা দৃষ্টি নেই।

শ্রীখণ্ড। শাসন আবার কি মশাই ? জানেন, ছেলেদের ধমক-ধামক শাসন এতে আমি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করি।

ভবদুলাল। আমারও ঠিক ঐ রকম। আমি যখন পাটনায় মাস্টার ছিলুম—একদিন একেবারে বারো-চোদ্দটা ছেলেকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দেখলুম সন্ধ্যার সময় ভারি ক্লেশ হতে লাগল—হাত টনটন কাঁধে ব্যথা।

সত্যবাহন। যাক, যে কথা বলছিলাম। আমরা আজ কদিন থেকে বিশেষভাবে চিন্তা করে বেশ বুঝতে পারছি যে এদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলো গুরুতর গলদ থেকে যাচ্ছে। কেবল নির্বিকল্প সত্যের অনুরোধেই আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। যথা—(পাঠ) প্রথম সাম্যসাধনাদি অবশ্য সম্পাদনীয় বিষয় অনৈকাগ্রতা, অনভিনিবেশ ও চঞ্চলচিত্ততা।

ভবতুলাল। 'চলচিত্তচঞ্চরি'—মনে হয়েছে।

সত্যবাহন। বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—বিবিধ মৌলিক বিষয়ে সম্যক শিক্ষাভাবজনিত খণ্ডাখণ্ড বিচারহীনতা। তৃতীয়—বিবেক-বৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা—

ভবতুলাল। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন। হোক দেরি। বিবেক-বৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত—

ভবতুলাল। ওটা বলা হয়েছে—

সত্যবাহন। আঃ—নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা ও আত্মপ্রচার-তৎপরতা। চতুর্থ—শ্রদ্ধা গাম্ভীর্যাদি পরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব। পঞ্চম—

শ্রীখণ্ড। দেখুন, ও-সব এখন থাক। আপনাদের এ-সব অভিযোগ আমরা অনেক শুনেছি। তার জবাব দেবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তাহলেও সম্যক শিক্ষাভাব বলে যেটা বলছেন সেটা একেবারে অন্যায়। যে-রকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক মেটাসাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি—তার সম্বন্ধে এমন অভিযোগের কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

সত্যবাহন। একশোবার পারি। তাহলে শুনবেন? আপনাদেরই কোন এক ছাত্রের কাছে কোন একটি ভদ্রলোক খণ্ডা-খণ্ডের যে ব্যাখ্যা শুনলেন—আমাদের নিকুঞ্জবাবুর দাদা বলছিলেন সে একেবারে রাবিশ—মানেই হয় না।

শ্রীখণ্ড। তাতে কি প্রমাণ হল? ও তো একটা শোনা কথা।

সত্যবাহন। দেখুন, নিকুঞ্জবাবু আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধু। তাঁর দাদাকে অবিশ্বাস করা আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলা একই কথা।

শ্রীখণ্ড। তাহলে দেখছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করতে হবে।

সত্যবাহন। দেখুন, উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত ভাবে কোনো প্রসঙ্গ করা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ।

ভবতুলাল। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন। আঃ—কেন বাধা দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করি খণ্ডাখণ্ডের যে তত্ত্বপর্যায় সেটা আপনারা স্বীকার করেন তো?

শ্রীখণ্ড। আমরা বলি, খণ্ডাখণ্ডটা তত্ত্বই নয়—ওটা তত্ত্বাভাষ। আর সমসাম্য যেটাকে বলেন সেটা সাধন নয়—সেটা হচ্ছে একটা রসভাব। আপনারা এ-সব এমনভাবে বলেন যেন খণ্ডাখণ্ড সমসাম্য সব একই কথা। আপনারা যেখানে বলেন—কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং, আমরা সেখানে বলি—কেন্দ্রগতং নির্বিশেষঞ্চ। কারণ ও-দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আপনারা যা আওড়াচ্ছেন ও-সব সেকেলে পুরোনো কথা—এ-যুগে ও-সব চলবে না। এ-কালের সাধন বলতে আমরা কি বুঝি শুনবেন—? (ছাত্রের প্রতি) বল তো, সাধন কাকে বলে।

ছাত্র। নবাগত যুগের সাধন একটা সহজ বৈজ্ঞানিক প্রণালী

যার সাহায্যে একটা যে কোনো শব্দ বা বস্তুকে অবলম্বন করে তারই ভিতর থেকে উত্তোরোত্তর পর্যায়ক্রমে নানা রকম অনুভূতির ধারাকে অব্যাহত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রীখণ্ড। শুনলেন তো? আপনাদের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাত। ওটা আবার বল তো হে।

ছাত্র। (পুনরাবৃত্তি)

সত্যবাহন। দেখুন, কোনো কথা ধীরভাবে শুনবেন সে সহিষ্ণুতা আপনার নেই। অকাট্য কর্তব্যের প্রেরণায় আপনারই উপকারের জন্য এ-কথা আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ঐ অহঙ্কার ও আত্মসর্বস্বতাই আপনার সর্বনাশ করবে। চলুন, ভবদুলালবাবু।

ভবদুলাল। এই একটু শুনে যাই। বেশ লাগছে মন্দ না।

সত্যবাহন। তাহলে শুনুন, খুব করে শুনুন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড—(প্রস্থান)

ভবদুলাল। হ্যাঁ, তারপর সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, ওটা এই আশ্রমের একটা বিশেষত্ব—একটা গ্রাজুয়েটেড সাইকো-থীসিস অভ ফোনেটিক ফরম্‌স। ওটা অবলম্বন করে অবধি আমরা আশ্চর্য ফল পাচ্ছি। অথচ আমাদের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পর্যন্ত এর সাধন করে থাকে। মনে করুন যে-কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—কতখানি জোরের কথা একবার ভাবুন তো?

ভবদুলাল। চমৎকার! আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে ওটা লিখতেই হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? 'গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে', গো মানে গরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং'; 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে—মিউজিক অভ দি স্ফায়ার্স—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ-খণ্ডিকায় এই রকম দেড়-হাজার শব্দ আমি খণ্ডন করে দেখিয়েছি। গরুর স্তোত্রটা বল তো হে।

ছাত্রগণ। খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী
শবদে শবদে মথিত অরণী,
ত্রিজগৎ যজ্ঞে শ্বাশত স্বাহা—
নন্দিত কলকল ক্রন্দিত হাহা!
স্তম্ভিত সুখ দুখ মন্থন মোহে
প্রলয় বিলোড়ন লটপট লোহে;
মৃত্যু ভয়াবহ হম্বা হম্বা

রৌরব তরণী তুহুঁ জগদম্বা
শ্যামল স্নিগ্ধা নন্দন বরণী
খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী ॥

ভবদুলাল। ঐ গোরুর কথা যা বললেন—আমি দেখেছি মহিষেরও ঠিক তাই। জয়রামের মহিষ একবার আমায় তাড়া করেছিল—তারপর যেই না গুঁতো মেরেছে অমনি দেখি সব বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। তখন মনে হল—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ। আচ্ছা আপনারা সমীক্ষা-টমীক্ষা করেন না?

শ্রীখণ্ড। ওগুলো মশায়, করে করে বুড়ো হয়ে গেলাম। আসল গোড়াপত্তন ঠিক না হলে ও-সবে কিছু হয় না। ওদের খণ্ডাখণ্ড আর আমাদের শব্দার্থ-খণ্ডন—দুটোই দেখলেন তো? আসল কথা ওদের মতলব হচ্ছে একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবেন। খণ্ড সাধন হতে না হতেই ওঁরা এক লাফে আগ ডালে গিয়ে চড়ে বসতে চান। তাও কি হয় কখনো?

নবীন। দেখুন, এরা কিছু শুনবে বলে আশা করে আছে। আপনি এদের কিছু বলুন।

ভবদুলাল। বেশ তো, দেখ বালকগণ, চলচিত্তচঞ্চরি বলে আমার একখানা বড় বই হবে—ডবল ডিমাই ৭০০ কি ৮০০ পৃষ্ঠা—দামটা এখনো ঠিক করিনি—একটু কম করেই করব ভাবছি—আচ্ছা, চার টাকা করলে কেমন হয়? একটু বেশি

হয়, না ? আচ্ছা ধরুন ৩।।০ টাকা ? ঐ বইয়ের মধ্যে নানারকম ভালো ভালো কথা লেখা থাকবে। তেমন মনে কর, এই এক জায়গায় আছে—চুরি করা মহাপাপ—যে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করে তাহাকে চোর বলে। তোমরা না বলে কখনো পরের জিনিস নিয়ো না। তবে অবিশ্যি সব সময় তো আর বলে নেওয়া যায় না। যেমন, আমি একবার একটি ভদ্রলোককে বললাম, 'মশায় আপনার সোনার ঘড়িটা আমাকে দেবেন ?' সে বলল, 'না দেব না।' ছোটলোক ! আমরা ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলাম তার নাম মনে নেই—তার মধ্যে একটা গল্প ছিল—তার সবটা মনে পড়ছে না—ভুবন বলে একটা ছেলে তার মাসির কান কামড়ে দিয়েছিল। মনে কর তার নিজের কান তো নয়—মাসির কান। তবে না বলে কামড়ে নিল কেন ? এর জন্য তার কঠিন শাস্তি হয়েছিল।

শ্রীখণ্ড। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই থাক। আবার আসবেন তো ?

ভবদুলাল। আসব বই কি ! রোজ আসব এই তো আজকেই আমার সতেরো পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এ রকম হপ্তাখানেক চললেই বইখানা জমে উঠবে। আচ্ছা আজ আসি।

[গুন-গুন গান করিতে-করিতে ভবদুলালের প্রস্থান]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[সাম্য-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ। ঈশান, নিকুঞ্জ, জনার্দন ও সোমপ্রকাশ উপবিষ্ট। সত্যবাহনের প্রবেশ]

জনার্দন। তারপর সেদিন ওখানে কি হল?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, আপনি কদিন আসেননি; আমরা শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছি।

সত্যবাহন। হবে আর কি, হুঁঃ! এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে শ্রীখণ্ডবাবু একদিন আমাদের একজন ছিলেন। আজ আমাদের সংস্পর্শে থাকলে তাঁর কি এমন দশা হত? সামান্য ভদ্রতা পর্যন্ত ওঁরা ভুলে গেছেন।

ঈশান। ভবতুলালবাবুকে ওখানেই রেখে এলেন নাকি?

সত্যবাহন। তাঁর কথা আর বলবেন না। তিনি তাঁর গুরুর নামটি একেবারে ডুবিয়েছেন। কি বলব বলুন, তাঁর সামনে শ্রীখণ্ডবাবু আমায় বার-বার কি রকম দারুণভাবে অপমান করতে লাগলেন—উনি তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না—উলটে বরং ওঁদের সঙ্গেই নানারকম হৃদ্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিকুঞ্জ। ছি, ছি, ছি, এ একেবারে অমার্জনীয়।

সোমপ্রকাশ। দেখুন, কিসে যে কি হয় তা কি কেউ বলতে পারে? আমরা অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছি ভবতুলালবাবু আমাদের ত্যাগ করেছেন—আমি বলি কে জানে?—

হয়তো অলক্ষিতে আমাদের প্রভাব এখনো তাঁর উপর কাজ করছে।

ঈশান। (গান) কিসে কি হয় কে জানে!

কেউ জানে না, কেউ জানে না

যার কথা সে বুঝেছে সে জানে।

[বাহিরে পদশব্দ ও গান গাহিতে-গাহিতে ভবতুলালের প্রবেশ—টুইঙ্কিল-টুইঙ্কিল-এর সুরে—ভয় ভয় ভীতি ভাবনা প্রভৃতি]

ঈশান। ও কি রকম বিশ্রী সুরে গাইছেন বলুন তো?

ভবতুলাল। ওটা আমার একটা নতুন গান।

ঈশান। আপনার গান কি রকম? আমি আজ পাঁচ-বছর ওটা গেয়ে আসছি। আর ওটার ও রকম সুর মোটেই নয়। ওটা এই রকম—(গান)।

ভবতুলাল। তাই নাকি? ওটা আপনার গান? ঐ যা, ওটাও আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে দিয়ে ফেলেছি। তা আপনার নামেই দিয়ে দেব?

নিকুঞ্জ। কি মশায়, আপনার আশ্রমিক পর্ব শেষ হল?

ভবতুলাল। কি বললেন? কি পর্বত?

নিকুঞ্জ। বলি আশ্রমের শখটা মিটল?

ভবতুলাল। হ্যাঁ, তুদিন বেশ জমেছিল, তারপর ওঁরা কি রকম করতে লাগলেন তাই চলে এলাম। আসবার সময় একটা ছেলের কান মলে দিয়ে এসেছি।

সোমপ্রকাশ। দূরবীক্ষণ যন্ত্র যেমন দূরের জিনিসকে কাছে এনে দেখায় তেমনি কিছুক্ষণ আগে আমার একটা অনুভূতি এসেছিল যে আপনি হয়তো আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

ভবদুলাল। ওঁদের আশ্রমে একটা দূরবীণ আছে—তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোসকা-ফোসকা মতন পড়ে যায়। বোধ হয় থাউজ্যাণ্ড হর্‌স্‌-পাওয়ার, কি তার চাইতেও বেশি হবে।

ঈশান। এত বুজরুকিও জানে ওরা।

জনার্দন। ওঁকে ভালোমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাঙ বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভবদুলাল। হ্যাঁ, ব্যাঙ বলতে মনে হল—সোমপ্রকাশের কথা ওঁরা কি বলেছেন শোনেননি বুদ্ধি?

সোমপ্রকাশ। না, না, কিছু বলেছেন নাকি?

ভবদুলাল। আমি ওঁদের কাছে সোমপ্রকাশের সুখ্যাত করছিলাম, তাই শুনে শ্রীখণ্ডবাবু বললেন যে আমরা চাই মানুষ তৈরি করতে—কতকগুলো কোলা ব্যাঙ তৈরি করে কি হবে?

নিকুঞ্জ। আপনি এর কোনো প্রতিবাদ করলেন না?

ভবদুলাল। না—তখন খেয়াল হয়নি।

সোমপ্রকাশ। মানুষকে চেনা বড় শক্ত। হর্বার্ট ন্যাথাম্ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ক্ষমতা এবং অক্ষমতা

দুইয়েরই মৌলিক রূপ এক। ওঁরা একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না।

ভবদুলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব স্বীকার করেন—এই তো সেদিন আমায় বলছিলেন যে ঈশেন আর সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দেখ আর ও বলে আমায় দেখ। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোসের মতন চেহারা, ওরও তেমনি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা!

সত্যবাহন। কি! এত বড় আস্পর্ধা! আমায় কানকাটা খরগোস বলে!

ভবদুলাল। না, না, আপনাকে তো তা বলেননি—আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ। কি অভদ্র ভাষা! আমায় কিছু বললে?

ভবদুলাল। আমি জিগগেস করেছিলুম—তা বললে, নিকুঞ্জ কোনটা?—ঐ ছাগলা দাড়ি, না যার ডাবা হুঁকোর মতো মুখ?

নিকুঞ্জ। আপনি কি বললেন?

ভবদুলাল। আমি বললাম ডাবা হুঁকো।

নিকুঞ্জ। নাঃ—এক-একটা মানুষ থাকে, তাদের মাথায় খালি গোবর পোরা!

ভবদুলাল। কি আশ্চর্য! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক তাই বলেন। বলেন ওদের মাথায় খালি গোবর—তাও শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেছে।

সত্যবাহন। এসব আর সহ্য হয় না। মশায়, আপনি ওখানে

ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?

ঈশান। আহা, ও কি? উনি আগ্রহ করে আসছেন সে তো ভালোই।

জনার্দন। হ্যাঁ, বেশ তো, উনি আসুন না।

সত্যবাহন। আগ্রহ কি নিগ্রহ কে জানে?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, অত অনুগ্রহ নাই করলেন।

ভবদুলাল। হাঃ, হাঃ, হাঃ, ওটা বেশ বলেছেন। ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গে একজন পড়ত—সেও ঐ রকম কথা গোলমাল করত। দ্রাক্ষাকে বলত দ্রাহ্মা! ঐ 'ক'-এ মূর্ধণ্য 'ষ'-এ ক্ষ, আর 'হ'-এ 'ম' হ্ম, বুঝলেন না?

সত্যবাহন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি মশায়।

ভবদুলাল। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফল। দ্রাক্ষা বলে এক রকম ফল আছে—মানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু তর্ক করে তো লাভ নেই। মনে করুন যদি বলেন নেই, তা সে আপনি বললেও আছে, না বললেও আছে। তাহলে তর্ক করে লাভ কি? কি বলেন?

সত্যবাহন। আপনার কাছে কোনো কথা বলাই বৃথা।

ভবদুলাল। না, না, বৃথা হবে কেন? ওটা আমার চলচিত্ত-চঞ্চরিতে দিয়েছি তো। আপনার নাম করেই দিয়েছি।

সত্যবাহন। আমার নাম করেছেন, কি রকম? আপনি তো

সাংঘাতিক লোক দেখছি মশায়। দেখুন, ঐ যা-তা লিখবেন আর আমার নামে চালাবেন—এ আমি পছন্দ করি না।

ভবদুলাল। বাঃ! নাম করব না? তা নইলে শেষটায় লোকে আমায় চেপে ধরবে আর আমি জবাব দিতে পারব না, তখন? সে হচ্ছে না। ঐ ঈশানবাবুর বেলাও তাই। যার-যার গান, তার-তার নাম।

সত্যবাহন। দেখুন, আপনি সহজ কথা বুঝবেন না আবার জেদ করবেন।

ভবদুলাল। ও, ভুল হয়েছে বুঝি? তা আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। সেই সেবার সজারুতে কামড়েছিল—

ঈশান। কি মশায়, সেদিন বললেন বেড়াল, আর আজ বলছেন সজারু!

ভবদুলাল। ও, তাই নাকি? বেড়াল বলেছিলাম নাকি? তা হবে। তা, ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখবার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু তো আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্বিশেষম্। কি বলেন? ওটাও দিয়ে দিই, কেমন?

সত্যবাহন। দেখুন, যে বিষয়ে আপনার বুঝবার ক্ষমতা হয়নি সে বিষয়ে এ রকম যা-তা যদি লেখেন তবে আপনার সঙ্গে আমার জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি।

ভবদুলাল। কি মুশকিল! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক ঐ রকম বললেন। ওঁদেরই কতকগুলো ভালো ভালো কথা সেদিন আমি

ছেলেদের কাছে বলছিলাম; এমন সময় উনি রেগে—'ও-সব কি শেখাচ্ছেন' বলে একেবারে তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিলেন। তাই তো চলে এলাম।

ঈশান। একি মশায়? খাতায় এসব কি লিখেছেন!

ভবদুলাল। কেন, কি হয়েছে বলুন দেখি?

ঈশান। কি হয়েছে? এই আপনার চলচিত্তচঞ্চরি? এসব কি? ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ঈশেনবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হাঁ করে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিঃশ্বাস উঠছে আর পড়ছে—সব ঝাপসা দেখছে—গা ঝিম-ঝিম—নাক্স ভমিকা থার্টি—

ভবদুলাল। বাঃ! ও ওগুলো তো আপনাদেরই কথা। শুধু নাক্স ভমিকাটা আমার লেখা।

[ঘোর উত্তেজনা]

সকলে। দিন দেখি খাতাখানা।

ভবদুলাল। আঃ—আমার চলচিত্তচঞ্চরি—

সত্যবাহন। ধ্যেৎ তেরি চলচিত্তচঞ্চরি—

ভবদুলাল। ওকি মশায়—টানাটানি করেন কেন? একে তো শ্রীখণ্ডবাবু তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন—হাঁ, হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি? দেখুন দেখি মশায়, আমার চলচিত্তচঞ্চরি ছিঁড়ে দিলে!

[ছেঁড়া খাতা সংগ্রহের চেষ্টা]

সত্যবাহন। এই ঈশানবাবুর যত বাড়াবাড়ি। আপনার ও-সব গান আর সমীক্ষা ওঁকে শোনাবার কি দরকার ছিল?

ঈশান। আপনি আবার আহ্লাদ করে ওঁর কাছে খণ্ডাখণ্ডের ব্যাখ্যা করতে গেলেন কেন?

ভবতুলাল। খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তা কি হয়েছে। আবার লিখব—চলচিত্তচঞ্চরি—লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড়-বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচিত্তচঞ্চরি—পাবলিশ্‌ড্‌ বাই ভবতুলাল। একুশ টাকা দাম করব। তখন দেখব—আপনাদের ঐ সাম্যঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত বিসূচিকা কোথায় লাগে।

[গান]

সংসার কটাহ তলে জ্বলে রে জ্বলে!
জ্বলে মহাকালানল জ্বলে জ্বল জ্বল,
সজল কাজল জ্বলে রে জ্বলে।
অলক তিলক জ্বলে ললাটে,
সোনালী লিখন জ্বলে মলাটে,
খেলে কাঁচাকচু জ্বলে চুলকানি
জ্বলে রে জ্বলে।

ভাবুক
সভা

ভাবুক-সভা

পাত্রগণ

ভাবুক দাদা

প্রথম ভাবুক

দ্বিতীয় ভাবুক

ভাবুক দল

॥ ভাবুক-সভা ॥

[ভাবুকদাদা নিদ্রাবিষ্ট—ছোকরা ভাবুকদলের প্রবেশ]

প্রথম ভাবুক। ইকি ভাই সম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা?
ভাবুকদাদা মূর্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা!

দ্বিতীয় ভাবুক। তাই তো বটে! আমি বলি এত কি হয় সহ্য?
সকাল বিকাল এমন ধারা ভাবের আতিশয্য!

প্রথম ভাবুক। অবাক কল্লে! ঠিক যেমন শাস্ত্রে
আছে উক্ত—
ভাবেব ঝোঁকে একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম!

দ্বিতীয় ভাবুক। ভাবটা যখন গাঢ় হয়—বলে গেছেন ভক্ত,
হৃদয়টাকে এঁটে ধরে আঠার মতো শক্ত।

প্রথম ভাবুক। (যখন) ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা
আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পালায় দেহ ছেড়ে—
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি শঙ্কা
হচ্ছে খুবই
আত্মা পুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে
ডুবি।
যেমন ধারা পড়ছে দেখ গুরু-গুরু নিশ্বাস,

বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কোরো নাকো বিশ্বাস।
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

[বিলাপ সঙ্গীত]

ভবনদী পার হবি কে চড়ে ভবের নায়?
ভাবের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে ভবের পারে যায় রে
ভাবুক ভবের পারে যায়।
ভবের হাটে ভাবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল?
ভাবের জমি চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে
ভাই ভবের পটোল তোল।
শান বাঁধানো মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে—
ভাবের মাথায় টোকা দিলে বাক্য-মানিক ঝরে রে মন
বাক্য-মানিক ঝরে।
ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায়
ভাব-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়।

[কীর্তন 'জমাট' হওয়ায় ভাবুকদাদার নিদ্রাচ্যুতি]

ভাবুক দাদা। জুতিয়ে সব সিধে করব, বলে রাখছি পষ্ট—
চ্যাঁচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট?

প্রথম ভাবুক। ঘুম কি হে? সিকি কথা? অবাক কল্লে খুব।
ঘুমোওনি তো—ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে—তেলী মুদি চাষা—

তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাস।

ভাবুক দাদা। সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভাবের রঙ ;
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।

প্রথম ভাবুক। তাই তো বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গুঁজি
ভাবের ঘোরে ভোঁ হয়ে যাই চক্ষু দুটি বুজি।

দ্বিতীয় ভাবুক। হাঃ হাঃ হা—দাদা তোমার বচনগুলো খাসা,
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্য রসে ঠাসা!

ভাবুক দাদা। ভাবের ঝোঁকে দেখতেছিলেম স্বপ্ন চমৎকার
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার।
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দমকায়,
গাছের পাতা শিহরি কাঁপে, বিজলী ঘন চমকায়
মাভৈ রবে ডাকছি সবে খুঁজছি ভাবের রাস্তা,
(এই) ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে স্বপ্ন হল ভ্যাস্তা।

প্রথম ভাবুক। যা হবার তা হয়ে গেছে—বলে গেছেন আর্য—
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য।

দ্বিতীয় ভাবুক। কি আশ্চর্য, ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশায়
এমনি করে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায়!

ভাবুক দাদা। অন্তরে যার মজুত আছে ভাবের খোরাকি—
(তার) ভাবের নাচন মরণ বাঁচন বুঝবি
তোরা কি?

দ্বিতীয় ভাবুক। পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা—আর কি প্রমাণ বাকি
পায়ের ধুলো দাও তো দাদা মাথায় একটু মাখি।

ভাবুক দাদা। সবুর কর স্থিরোভব, রাখ এখন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আসছে, সরে দাঁড়াও
এক্ষুনি !

[ভাবের ধাক্কা]

প্রথম ভাবুক। বিনিদ্র চক্ষু, মুখে নাহি অন্ন
আক্কেল বুঝি জড়তাপন্ন !
স্নানবিহীন যে চেহারা রুক্ষ—
এত কি চিন্তা—এত কি দুঃখ ?

দ্বিতীয় ভাবুক। সঘনে বহিছে নিশ্বাস তপ্ত—
মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত।
দিন নাই রাত নাই—লিখে লিখে হাত ক্ষয়—
একেবারে পড়ে গেলে ভাবের পাতকোয় !

ভাবুক দাদা। শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত
আকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য—
নাচে ল্যাগব্যাগ তাণ্ডব তালে
ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।
জাগ্রত ভাবের শব্দ পিপাসা
শূন্যে শূন্যে খুঁজিছে ভাষা।
সংহত ভাবের ঝঙ্কার মাঝে
বিদ্রোহ ডম্বরু অনাহত বাজে।

দ্বিতীয় ভাবুক। (হ্যাঁ-হ্যাঁ) ঐ শোনো হুড়দাড় মার-মার শব্দ
দেবাসুর পশুনর ত্রিভুবন স্তব্ধ।

প্রথম ভাবুক। বাজে শিঙা ডম্বরু শাঁখ জগঝম্প,
ঘন মেঘ গর্জন, ঘোর ভূমিকম্প—!

ভাবুক দাদা।

কিসের তরে দিশেহারা ভাবের ঢেঁকি পাগল পারা
আপনি নাচে নাচে রে!
ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্যধ্বনি চিত্তধামে
গভীর সুরে বাজে রে!
নাচে ঢেঁকি তালে-তালে যুগে-যুগে কালে-কালে,
বিশ্ব নাচে সাথে রে!
রক্ত-আঁখি নাচে ঢেঁকি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি
নৃত্যে মাতে মাতে রে!

প্রথম ভাবুক। চিন্তা পরাহতা বুদ্ধি বিশুষ্কা
মগজে পড়েছে ভীষণ ফোসকা!
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে!
ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদা রক্ষে!

দ্বিতীয় ভাবুক। সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব,
ভাবিয়া-ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ!

ভাবুক দাদা। অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া!
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা।
যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে

'অর্থ-অর্থ' করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে!
(আরে) অর্থের শেষ কোথা কোথা তার জন্ম
অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকের কম্ম ?
অভিধান, ব্যাকরণ, আর ঐ পঞ্জিকা—
ষোলো আনা বুজরুকী আগাগোড়া গঞ্জিকা।
মাখন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খাদ্য,
(আর) ভাবশূন্য গবেষণা—একি ভূতের
বাপের শ্রাদ্ধ ?

[ভাবের নামতা]

ভাবের পিঠে রস তার উপরে শূন্যি—
ভাবের নামতা পড় মানিক বাড়বে কত পুণ্যি—
(ওরে মানিক মানিক রে নামতা পড় খানিক রে)
ভাব একে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপ্‌শিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
(ওরে মানিক মানিক রে চুপটি কর খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়।
(ওরে মানিক মানিক রে এবার গাছে চড়
খানিক রে)

॥ যবনিকা পতন ॥

শ্রীশ্রী
শব্দকল্পদ্রুম

পাত্রগণ

হরেকানন্দ
জগাই
বেহারী
পটলা
বিশ্বম্ভর
গুরুজি

বৃহস্পতি
ইন্দ্র
অশ্বিনী
নারদ
কার্তিক
বিশ্বকর্মা

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[গুরুজির আশ্রম। হরেকানন্দ, জগাই, বেহারী, পটলা, বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য শিষ্যরা উপবিষ্ট]

হরেকানন্দ। দেখ জগাই, তুই বললে বিশ্বেস করবিনে—

সকলে। কেউ বিশ্বেস করবে না—

হরেকানন্দ। কাল থেকে মনটা আমার এমনি ওলটপালট করছে, সারারাত আর ঘুম হয়নি। দুপুরে একটু তন্দ্রার ভাব এয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রশ্নটা তেড়ে উঠে মনের মধ্যে এমনি গুঁতো মারলে—

জগাই। ওর একটা কবিরেজী ওষুধ আছে খুব ভালো— আয়াপানের শেকড় না বেটে—

হরেকানন্দ। দেখ্ বড় যে বেশি ওপর চালাকি কচ্ছিস, এক কথায় সব কটার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি—জানিস? পরশু রাত্তিরে গুরুজি নিজে আমায় ডেকে নিয়ে যেসব ভেতরকার কথা বলেছেন, জানিস?

বেহারী। হ্যাঁরে পটলা, সত্যি নাকি?

পটলা। কিসের? সব মিছে কথা।

বেহারী। এমন মিথ্যে কথা বলতে পারে এই হরেটা— ছিঃ ছিঃ রাম-রাম—

[বেহারীর সঙ্গীত]

রাম কহ—ইয়ে রাম কহ

বলবেন না আর মশাই গো, মানুষ নয় সব কষাই গো

তলে তলে যত শয়তানী—(রাম কহ)

এই কিরে তোদের ভদ্রতা ঘ্যান-ঘ্যান ক্যাঁচ-ক্যাঁচ সর্বদা

ডুবে-ডুবে জল খাও সব জানি (রাম কহ)

হরেকানন্দ। প্রশ্ন যখন এয়েছে, জবাব তার একটা আসবেই আসবে—তা তোমাদের ধমকানি আর চোখরাঙানি, হাসি-ঠাট্টা আর এয়ার্কি, এসব বেশিদিন টিকছে না।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হে, তর্কটা কিসের একবার শুনতে পাই কি? কিই বা প্রশ্ন হল আর তা নিয়ে মামলাটাই বা কিসের? আচ্ছা, হরিচরণ কি বল?

হরেকানন্দ। হরিচরণ! দেখলি আমায় হরিচরণ বলছে! 'হরিচরণ' কি মশাই?

বিশ্বম্ভর। তবে, ওরা যে 'হরে'-'হরে' বলছিল!—

হরেকানন্দ। হরে বললেই হরিচরণ? 'ক' বললেই কার্তিকচন্দ্র?

জগাই। ওঁর নাম শ্রীহরেকানন্দ—

বিশ্বম্ভর। হরে কাননগু—

হরেকানন্দ। আরে খেলে যা! তুমি কোথাকার মুখ্যু হে?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে, ফরেশডাঙার—আপনি?

হরেকানন্দ। দেখ, এই যে ছ্যাবলামি আর ডোণ্ট কেয়ার এসব ভালো নয়। কাউকে যদি নাই মানবে, তবে বাপু ইদিকে এসো-টেসো না।

[হরেকানন্দের মৌনাবলম্বন—সাড়ম্বর]

বেহারী। (জনান্তিকে) দেখ্ পটলা—সিদিন রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—কদিন থেকে গুরুজিকে বলব-বলব ভাবছি—কিন্তু ঐ হরেটার জন্যে বলা হচ্ছে না। দেখলি না, সেদিন ঐ ফকিরের গল্পটা বলতেই কি রকম হেসে উঠল—গল্পটা জমতেই দিল না।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ, হ্যাঁ? ফকিরের স্বপ্নটা কি হয়েছিল?

বেহারী। আ মোলো যা! মশাই, আমরা-আমরা কথা কইছি—আপনি মধ্যে থেকে অমন ধারা করছেন কেন?

বিশ্বম্ভর। ও বাবা! এও দেখি ফোঁস করে! মশাই, আমার ঘাট হয়েছে—আপনাদের কথা আপনারা বলুন—আমার ওসব শুনে-টুনে দরকার নেই—

[বিশ্বম্ভরের সঙ্গীত]

শুনতে পাবিনে রে শোনা হবে না
এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।
(কেউ বা বুঝে না)

কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে-দফে
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখো না গোঁফে
(কাঁঠাল পাবে না)

একটি-একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান
(সাবান পাবে না)

বেশ বলেছ ঢের বলেছ ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি
(হাঁড়ি ভাঙবে না)

বেহারী। আচ্ছা, রাগ করেন কেন মশাই? আমি স্বপ্ন দেখেছি বই তো নয়—আর সে স্বপ্নও এমন কিছু নয়! আমি দেখলুম, একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে এক সন্নিসি বসে-বসে ঘড়-ঘড় করে নাক ডাকছে!

বিশ্বম্ভর। বলেন কি মশাই? তারপর?

বেহারী। ব্যস্! তারপর আর কি? সে নাক ডাকছে তো ডাকছেই!

বিশ্বম্ভর। কি আশ্চর্য! আপনার গুরুজিকে জিগগেস করবেন তো—

পটলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওটা চেপে গেলে চলবে না দাদা—ওটা বলতে হবে। দেখিস, তখন হরেটার মুখ একেবারে দিস্‌কাইণ্ড অভ স্‌মল হয়ে যাবে—

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ বুঝলেন, বেশ একটু রঙ-চঙ দিয়ে বলবেন।

বেহারী। আ মোলো যা! আমার স্বপ্ন আমার যেমন ইচ্ছা তেমন করে বলব।

[গুরুজির শুভাগমন। হরেকানন্দ ও বেহারীলালের যুগপৎ কথা বলিবার চেষ্টা]

{ হরেকানন্দ। একটা প্রশ্ন এই কদিন থেকে—
{ বেহারী। সিদিন একটা স্বপ্ন দেখলুম—

হরেকানন্দ। তার জন্যে দুদিন ধরে আর সোয়াস্তি নেই—
বেহারী। একটু নিরিবিলি যে জিগগেস করব তার তো যো নেই—

হরেকানন্দ। তাই জগাইকে আমি বলছিলুম—
বেহারী। পটলা জানে আর এই ভদ্রলোকটি সাক্ষী আছেন—

হরেকানন্দ। আঃ—কথা বলতে দাও না—
বেহারী। কেন ওরকম করছ বল দেখি?

গুরুজি। এত গোলমাল কিসের?

বেহারী। আজ্ঞে, হরে বড় গোলমাল কচ্ছে—

হরেকানন্দ। বিলক্ষণ! দেখলেন মশাই—

বেহারী। হয়েছে কি আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি।

বেহারী। আমি স্বপ্ন দেখলুম, অমাবস্যার রাত্তিরে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঢুকে আর বেরুবার পথ পাচ্ছিনে। ঘুরতে-ঘুরতে এক জায়গায় দেখি এক সন্নেসি—

পটলা। তার মাথায় ইয়া বড় জটা—

বিশ্বম্ভর। তার গায়ে মাথায় ভস্মমাখা—তার ওপর রক্তচন্দনের ছিটে—

বেহারী। (স্বগত) কি আপদ! স্বপ্ন দেখলুম আমি আর রঙ ফলাচ্ছেন ওঁরা!—সন্নেসিকে খাতির-টাতির করে পথ জিগগেস করলুম—বললে বিশ্বেস করবেন না মশাই, সে

কথার জবাবই দিলে না। বসে ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড় করে নাকই ডাকছে, নাকই ডাকছে।

পটলা। সে নাক ডাকানি এক অদ্ভুত ব্যাপার—নাক ডাকতে-ডাকতে সারে গামা পাধা নিসা···করে সুর খেলাচ্ছে।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আর সাতটে সুরের সঙ্গে রামধনুর সাতটে রঙ একবার ইদিক আসছে, একবার উদিকে যাচ্ছে।

বেহারী। সুরের সঙ্গে রঙের সঙ্গে না মিশে দেখতে-দেখতে দেখতে-দেখতে চারিদিক সব ফরসা হয়ে উঠল—আমি তো অবাক হয়ে হাঁ করে রইলুম!

বিশ্বম্ভর। যে বলে এটা বাজে স্বপ্ন, সে নাস্তিক!

গুরুজি। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! এ একেবারে ভেতরকার প্রশ্নে এসে ঠেকেছে—এতদিন বলব-বলব করেও যে কথা বলা হয়নি, সেই কথার মূলে এসে ঘা দিয়েছ! বৎস হরেকানন্দ, তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থ ই বটে।

বেহারী। ও তো স্বপ্ন দেখেনি—আমি দেখেছিলুম—

পটলা। হ্যাঁ—ওরা তো দেখেনি আমরা দেখেছিলুম—

হরেকানন্দ। আমি তো এই বিষয়ই প্রশ্ন করব ভেবেছিলুম কিনা। ঐ যে ভেতরকার প্রশ্ন যেটা বলে-বলেও বলা হচ্ছে না, আমার প্রশ্নই হচ্ছে তাই।

গুরুজি। হ্যাঁ। তোমরা স্বপ্নে যা দেখেছ তা যথার্থ ই বটে। শব্দই আলোক! শব্দই বিশ্ব—শব্দই সৃষ্টি—শব্দই সব!

আর দেখ, সৃষ্টির আদিতে এক অনাহত শব্দ ছিল, আর কিছুই ছিল না। দেখ, প্রলয়ের শেষে যখন আর কিছু থাকবে না—তখনো শব্দ থাকবে। এই যে শব্দ, এ সেই শব্দ। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, যে শব্দের আর অন্ত নেই, মানুষ ঘাটে-ঘাটে ধাপে-ধাপে যুগের পর যুগ প্রশ্ন করতে-করতে যার কিনারা পায়নি—সেই শব্দের তুমি নাগাল পেয়েছ। একে বলে অন্তর্দৃষ্টি। দেখ, শব্দকে তোমরা তাচ্ছিল্য কোরো না—এই শব্দকে চিনতে পারেনি বলেই, এই আমি আসবার আগে, যে যা কিছু করতে চেয়েছে সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। ওই কথাটুকু বলবার জন্যই আমি এতদিন দেহ ধারণ করে রয়েছি।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন! আমার মনের কথাটা টেনে বলেছেন। এ সংসার মায়াময়—সবই অনিত্য—দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার? সব ছুদিন আছে ছুদিন নেই। বুঝলেন কিনা? আমি ছেলেবেলায় একটা পদ্য লিখেছিলুম, শুনবেন? কি না?

[বিশ্বম্ভরের আবৃত্তি]

ভব পান্থ বাসে এসে কেঁদে-কেঁদে হেসে-হেসে
ভুগে-ভুগে কেশে-কেশে, দেশে-দেশে ভেসে-ভেসে
কাছে এসে ঘেঁষে-ঘেঁষে, এত ভালো বেসে-বেসে
টাকা মেরে পালালি শেষে!

গুরুজি। বেদ বল, পুরাণ বল, স্মৃতি বল, শাস্ত্র বল, এ সব

কি ? কতগুলো বাক্য, অর্থাৎ কতকগুলো শব্দ—এই তো ? এই যে সব শঙ্খ-ঘণ্টা, মন্ত্রতন্ত্র হ্রীং-ক্লীং ঝাড়-ফুঁক নাম-জপ এসব কি ? এ কি শব্দ নয় ? সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব-হব কচ্ছিল, তখন যদি 'ওম' শব্দ করে প্রণব ধ্বনি না হত, তবে কি সৃষ্টি হতে পারত ? শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়। বেশি কথায় কাজ কি ? বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ কেন ? শিবের মুখে বিষাণ কেন ? হাতে তার ডমরু কেন ? নারদ যখন স্বর্গে যায়, চলতে-চলতে বীণা বাজায় কেন ? এসব কি শব্দ নয় ? আর অনাদিকাল হতে যে অনাহত শব্দ যোগীদের ধ্যান-কর্ণে ধ্বনিত হয়ে আসছে সে কি শব্দ নয় ? আর সেই কালিন্দীর কূলে যমুনার তীরে শ্যামের যে বাঁশরী বেজেছিল, সেও কি শব্দ নয় ? এমনি করে ভেবে দেখ, যা ভাববে তাই শব্দ—শাস্ত্রে বলেছে 'শব্দ ব্রহ্ম'—

বিশ্বম্ভর। আমাদের মতিলাল সেবার যে ভুঁই পটকা বানিয়েছিল, উঃ—তার যে শব্দ ! আমি ও বিষয়ে একটা কবিতা লিখেছি শুনবেন ?

হরেকানন্দ। দেখ গুরুজির সামনে এরকম বেয়াদবি, এটা কি ভালো হচ্ছে ?

বিশ্বম্ভর। ভালো রে ভালো ! ইনি বলছেন স্বপ্নের কথা—উনি তাঁর প্রশ্ন হাঁকছেন, এ-ও ফোড়ন দিচ্ছে—ও-ও ফোড়ন দিচ্ছে—আর আমি কথা কইলেই যত দোষ ?

বেহারী। আহা, গুরুজি আছেন যে, তাঁকে ডিঙিয়ে কথা বলবে ?

বিশ্বম্ভর। গুরুজির ন্যাজ ধরে-ধরেই যে ঘুরতে হবে তাঁর মানে কি ?

জগাই। ন্যাজ বলেছে ! গুরুজির ন্যাজ বলেছে !

পটলা। তুই থাম না, তোর ন্যাজ তো বলেনি—

গুরুজি। ওরে হতভাগা, শব্দ নিয়ে তোরা ছেলেখেলা করিস —শব্দ যে কি জিনিস আজও তোরা বুঝলিনে। কিন্তু এখন বুঝবার সময় হয়েছে। এই নাও আমার শব্দসংহিতা— এইটে এখন পড়ে নাও। ওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি এই যে—এক-একটি শব্দ এক-একটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে বেড়ায়। তাই কথা বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে উর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কি না ! যে সঙ্কেত জানে সে ঐ কুণ্ডলীর সাহায্যে করতে না পারে এমন কাজই নেই। তাই বলছি তোমরা প্রস্তুত হও—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে সেই সঙ্কেত মন্ত্র দিয়ে তোমাদের দেখাব, শব্দের কি শক্তি ! রাতারাতি স্বর্গ বরাবর পৌঁছে দেবে। পথ-পথ করে সব ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

[শিষ্যগণের উচ্ছ্বাস ও গদগদভাব]

[গান—ধুম কীর্তন]

তাই ফিরি তুমি আমি ধাঁধায় দিবস যামী
তাই ফিরে মহাজন পথে-পথে অনুখন
অন্ধ আঁধারে মরে নামি।
নিজবেগে নিজ তালে শব্দ ফিরে দেশে কালে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
ভুবন ঘেরিল পথ জালে।
প্রাণে-প্রাণে এঁকে-বেঁকে পথ যায় হেঁকে-হেঁকে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
সেই পথে চল আগে থেকে ॥

গুরুজি। পূর্বে-পূর্বে ঋষিরা এই শব্দমার্গকে ধরে-ধরেও ধরতে পারেনি। কেন? ঐ যে সন্নেসি অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছিল, কেন ডাকছিল? শব্দমার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সঙ্কেতটুকু ধরতে পারেনি। ওরা যে ধরেছে সে সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—ঢোঁড়া শব্দ। তা করলে তো চলবে না! জ্যান্ত-জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে-ধরে মটমট করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে-জমে উঠতে থাকবে—আর ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলবে। এইজন্যে তোমাদের ঐ শব্দসংহিতাখানা পড়ে রাখতে বলছি।

[গুরুজির প্রস্থান। শিষ্যগণের 'শব্দসংহিতা' পাঠ]

শ্রীশ্রীগুরু প্রসাদগুণে তত্ত্বদৃষ্টি লভি
জগৎখানা ঠেকছে যেন শব্দে আঁকা ছবি
শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া
চক্রমুখে মন্ত্র ঠুকে বাঁধন কর ঢিলা
শব্দ দিয়ে শব্দ কাটো, এই তো শব্দলীলা,
যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত্য তাঁহা পাতালপুরী
সত্য মিথ্যা একই মূর্তি খেলছে লুকোচুরি !
ভালো মন্দ বিষম ধন্দ্ব কিছু না যায় বোঝা
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা।
ভক্ত বলেন 'আদ্যিকালের শাদার নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হলে তারেই বলে আলো।'
শাস্ত্রে বলে 'সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি'
জগৎ স্রোতে জড়ের বাঁধন শব্দে রাখে বাঁধি।
বস্তুতত্ত্ব বদ্ধ মায়া সত্য পরিহরি
শব্দ চক্রে ঘোরে বিশ্ব সূক্ষ্ম দেহ ধরি !
শব্দ ব্রহ্মা, শব্দ বিষ্ণু, শব্দ সরস্বতী
বিশ্বযজ্ঞ ধ্বংসশেষে শব্দে মাত্র গতি ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য । স্বর্গ কাণ্ড ॥

গুরুজি । ঘনায়েছে কলিকাল ঘেরিয়া আঁধার জাল
পাতিয়ে প্রলয় ফাঁদ কাল রাহু ধরে চাঁদ ।
ওই শোনো অতি দূরে সুদূর অসুর পুরে
ভেদিয়া পাতাল তল ওই ওঠে কোলাহল ;
ওই রে আঁধার ফুঁড়ি ওই আসে গুড়ি-গুড়ি
ঐ এল লাখে লাখ দলে-দলে ঝাঁকে ঝাঁক ॥

[গান]

সকলে । ওরে ভাই তোরে তাই কানে-কানে কইরে
ঐ আসে ঐ আসে ঐ-ঐ-ঐ-রে
নিঝুম রাতে ফিসফাস, বাতাস ফেলে নিশ্বাস
স্বপ্নে যেন খোঁজে কারে কৈ-কৈ-কৈ-রে !
আঁধার করে চলাচল স্তব্ধ দেহ রক্ত জল
শব্দ নাচে হাড়ে-হাড়ে হৈ-হৈ-হৈ-রে ।
পাণ্ডু ছায়া অন্ধ হিম শূন্যে করে ঝিমঝিম
ঐরে গেল গা ঘেঁষে আর তো আমি নই রে ।
মর্মকথা বলি শোন্ লাগল প্রাণে 'কলিশন্'
প্রাণপণে হেঁকে বল মাভৈ-ভৈ-রে ॥

গুরুজি ।

দেবতা সবে গাত্র তোলো স্বপ্নলীলা সাঙ্গ হল
দেখ্ রে জেগে কাণ্ডটা কি সৃষ্টি বাঁধন ভাঙল নাকি ?

ঈশান কোণে মেঘের পরে শব্দ তরল রক্ত ঝরে
পাণ্ডু বরণ দখিনে বাসে অন্ধ আঁধার শব্দ নামে।
প্রলয় বাদল রক্ত রাঙা পাগল জেগেছে আগল ভাঙা
উল্কা ঝলকে বিজলী ছোটে গহন শূন্য শিহরি ওঠে।
তুহিন তিমির ধরণী গায় সভয় পবন থমকি চায়
হরষে পিশাচী পিশাচে কয় রক্ত মড়ক জগৎময়॥
হে অলক্ষ্মী একি খেলা অনাহূত হেন বেলা
নৃত্য তোমার এমনি ধারা সৃষ্টিছাড়া ছন্দোহারা!
অনাদৃত হুহুঙ্কময়ী খেয়াল তব সর্বজয়ী—
কহ আজি কেন স্কন্ধে, চাপিলে নাছোড়বন্দে!
কেন ঠাট্টা সর্বনাশী, কেন অট্ট আঁধার হাসি,
কেন আজি ঘুমটি ভাঙাও অকারণে চক্ষু রাঙাও?

[গান]

কেন-কেন কেনরে কেন-কেন?
চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ কেন?
পটকা শব্দ অট্ট রোল, শঙ্খ ঘণ্টা ঢক্ক ঢোল
স্বর্গপুরী হদ্দ হইল বাদ্যভাণ্ড হট্টগোল।
দেবতা বিলকুল কান্দে গো তল্পিতল্পা বান্ধে গো
পাগলা রাহু একলা তেড়ে গিলতে চাহে চান্দে গো।
আগডুম বাগডুম শব্দ ছায় চিত্ত গুড়গুড় দপদপায়
দন্ত কড়কড়, হাড্ডি মড়মড়, প্রাণটা ধড়ফড় সর্বদাই॥

গুরুজি। কাকস্য পরিবেদনা বৎসগণ আর কেঁদ না,
গতস্য শোচনা নাস্তি যথা কর্ম তথা শাস্তি ;
মিথ্যা এত কান্না কেন অলমতি বিস্তারেণ ?
অত্র এখন দেবতা সভায় ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে সবাই
তোমরা একটু ক্ষান্ত হও শান্ত হয়ে মন্ত্র কও ॥

[বৃহস্পতির স্তোত্রপাঠ]

এ ভব সঙ্কট অর্ণব মন্থনে মাকুর সংহার
মাকুর সংহার মাকুর সংহার মাকুর হে
হে গুরু গীস্পতি অষ্টম দিকপতি
হে গুরু রক্ষ হে গুরু রক্ষ হে গুরু হে ॥

[বৃহস্পতির আবির্ভাব]

বৃহস্পতি। মাকুর কোলাহল ভো ভো শিষ্য হে
দরজাটুকু ছেড়ে বস আজকে বড় গ্রীষ্ম হে,
আসনটাকে মাড়িও না বস না কেউ সোফাতে।
তোমার গায়ে গন্ধ বড় সরে দাঁড়াও তফাতে।
কি বলছিলে বলে ফেল নেইকো আমার চাকর-বাকর—
সময় কেন নষ্ট কর করে মেলা বকর-বকর ?
কারুর বাড়ি যোগ্যি নাকি বংশ প্রথা চিরন্তন ?
তোমার বুঝি ছেলের ভাতে ফলার ভোজে নিমন্ত্রণ ?
তোমার বুঝি মেয়ের বিয়ে—আটকে ছিল অনেক দিন ?
যা হোক এবার উতরে গেল রয়ে সয়ে বছর তিন॥
তোমার বাড়ি শ্রাদ্ধ নাকি ? ঘর জামাইটি গেছেন মরে

বেজায় বুঝি ভুগেছিল ডেঙ্গু জ্বরে বছর ভরে ?

সকলে। বিপদকালে হ্যাপস্থিতে ঠাকুর মোদের যুক্তি দাও
ঐ চরণের শরণ নেব মরণ হতে মুক্তি দাও ॥

বৃহস্পতি।

মরবে যে তা আগেই জানি—যেমনতর অনাসৃষ্টি
ইন্দ্র তোমার এ সব দিকে একেবারেই নেইকো দৃষ্টি !
কাজে কর্মে নেইকো ছিরি কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই
অমৃত সে ভেজাল গোলা দেবতাগুলো খাচ্ছে তাই।
মড়ক সে তো হবেই এতে সর্দিগর্মী বেরিবেরি
একে-একে মরবে সবাই আর বেশি দিন নেইকো দেরি।
হাজার কর ডিসিনফেক্টো, হাজার কেন ওষুধ গেলো—
যাহোক তোমরা যে-যার মতো উইল-পত্র লিখে ফেলো ॥
দেবতা লীলা সাঙ্গ যদি নেহাত যাবে জাহান্নমে
যার যা কিছু দেবার থাকে দাও না লিখে আমার নামে !

[বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ ও গান]

ও বীণা তুই দেখবি মজা বাস্থি বাজা (তারে না তা না)
হেন সুযোগ মাগ্যি বড় ও বীণা তোর ভাগ্যি বড়
এত মজা আর পাবি না পাগলা বীণা (তারে না তা না)
নাচি আমি সঙ্গে তোরই, বাহু তুলে রঙ্গ করি
তোরে বাজাই আপনি বাজি নাচিয়ে নাচি (তারে না তা না)
লাঠালাঠি রক্ত মাটি দেখে লাগে দাঁত কপাটি
ও বীণা তুই থাকবি তফাত লাগবে হঠাৎ (তারে না তা না)

বৃহস্পতি।

কি গো ঠাকুর অলুক্ষুণে—ঝাড়তে এলে পায়ের ধুলো ?
দেখছি এবার হ্যাপায় পড়ে মরবে তবে দেবতাগুলো।

নারদ।

নাকে ছিপি কানে তুলো ভায়া বড় বিজ্ঞ যে
ডিঙোতে চাও টপাট্টপ আমা হেন দিগ্‌গজে।

[ইন্দ্র ও অশ্বিনীর প্রবেশ]

ইন্দ্র।

শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম যুদ্ধু-টুদ্ধু লাগল কি ?
দৈত্য দেখে ভীষণ ভয়ে দেবতারা সব ভাগল কি ?

বৃহস্পতি।

ওঁর কথা কেউ শুনো নাকো ঠাকুর বড় রগচটা
তাই তো ইন্দ্র তোমার হাতে দেখছি না যে বজ্রটা !

ইন্দ্র।

বজ্র সে কি হেথায় আছে, গিয়েছে সে কোন চুলোয়
তার বেঁধে তায় কাজে লাগায় মর্তলোকের লোকগুলোয়।

নারদ।

তোমাদের খুব স্নেহ করি, কাজ কি বলে সবিস্তার
এমনি উপায় বাতলে দেব একেবারে পরিষ্কার॥

বৃহস্পতি।

একটা উপায় আছে বটে—তোমায় সেটা খুলে জানাই
হাড় কখানা দাও না মোদের নতুন করে বজ্র বানাই।

তোমার হাড়ে বজ্র গড়ে পিটলে পরে দমাদম
একটি ঘায়ে মরবে না যে সেই ব্যাটারাই নরাধম।
শুষ্ক হাড়ে ঘুণ ধরেছে, সূক্ষ্মতর শক্তি তায়
জ্বলবে ভালো হাড্ডি তোমার কাজ কি বল বক্তৃতায়॥

নারদ।

হোঁৎকামুখো গণ্ডে গোদ আমার ওপর টিপ্পুনী
আমায় তুমি মরতে বল? মরবে তুমি এক্ষুণি!
আমার ওপর চক্ষু ঠারো? আমায় বল কুন্দুলে
মুখে মাখ জুতোর কালি—গালে লাগাও চুনগুলো।

[কার্তিকের প্রবেশ]

কার্তিক।

আমায় সবাই মাপ কোরো ভাই, হয়ে গেল আসতে দেরি
হিসেব মতো পছন্দসই হচ্ছিল না চোস্ত টেরি!
গোঁফ জোড়াটা মেপে দেখি ডাইনে একটু গেছে উঠে
লাগল দেরি সামলে নিতে টেনেটুনে ছেঁটেছুঁটে।
চাকর ব্যাটা খেয়ালশূন্য কাজে কর্মে ঢিলে দিয়ে
শেষ মুহূর্তে কাপড়খানা কুঁচিয়ে দিল গিলে দিয়ে॥

নারদ।

তুমিই এখন ভরসা এদের তুমিই এদের কর্ণধার
তুমিই এদের ত্রাণ কর ভাই নইলে সবই অন্ধকার!
বলছি এদের বারে-বারে নেই রে উপায় যুদ্ধ বই
তোমরা সবাই হটলে এখন কোথায় আমি মুখ লুকাই?

কার্তিক।

লড়াই করে মরতে যাব আর তো আমার সেদিন নয়
কারে তুমি হুকুম কর শর্মা কারো অধীন নয়!
যে কয়জন যুদ্ধে যাবেন ফিরবে না তার অর্ধেকও
তল্পিতল্পা বাঁধ রে ভাই থাকতে সময় পথ দেখ।

১। আমি বলি ঢের হয়েছে শান্তি বাদ্য পিটিয়ে দাও
হাঙ্গামাতে কাজ কি বাপু আপোষ করে মিটিয়ে দাও!

২। শাস্ত্রে বলে শোন রে চাচা আপনা বাঁচা আগে ভাগে—
পিট্টি খেয়ে মরবি কেন থাকলে দেহ কাজে লাগে!

৩। কিসের দাদা স্বর্গভূমি কিসের পুরী পাঁচতলা
দৈত্য যখন ধরবে ঠেসে করবে তুমি কাঁচকলা।

৪। ত্যাগ কর ভাই মিথ্যে মায়া ত্যাগ কর এ স্বর্গধাম
আর তো সবই ছাড়তে পার প্রাণটুকুরই বড্ড দাম!

নারদ।

কিসের এত ভাবনা তোদের মিথ্যে এত কিসের ডর
যুক্তি করে দেখ্‌না ভেবে ঠাণ্ডা হয়ে হিসেব কর!
না হয় দুটো খসবে মাথা না হয় দুটো ভাঙত ঠ্যাং
তাই বলে কি ঢুকবি ভয়ে কুয়োর মধ্যে জ্যান্ত্‌ ব্যাঙ!
আমরা যদি দেবতা হতুম দৈত্য দেখলে ক্যাঁক করে
ঘাড়টি ধরে পিট্টি দিতুম হাড্ডি মাসে এক করে॥

ইন্দ্র।

অস্ত্রগুলো মর্চে-পড়া অনেক কালের অনভ্যাস

এমন হলে লড়বে নাকো স্বয়ং বলেন বেদব্যাস ॥

নারদ।

বিষ্টু বল আত্মা পাখি! এমন দিনও ঘটল শেষে
দৈত্য বেড়ায় বুক ফুলিয়ে দেবতা পালায় ছদ্মবেশে!
আসছি ধেয়ে ব্যস্ত হয়ে পয়সা-কড়ি খরচ করে
করলে না কেউ খাতির আমায় ডাকলে না কেউ গরজ করে!
তোমরা সবাই ডুবে মরো ইন্দ্র তোমার গলায় দড়ি
কার্তিকেয় মরবে তুমি ঐরাবতের তলায় পড়ি।
মরব এবার দেহত্যাগে এ-ভবে আর থাকছিনে কো
ঐখেনেই মূর্ছা যাব তোমরা সবাই সাক্ষী থেক ॥

[শয়ন ও মূর্ছা]

ব্রহ্মহত্যা আমার ঘরে ও ঠাকুর তোর পায়ে পড়ি
মরতে চাও তো বাইরে মর আমরা কেন দায়ে পড়ি?
অশ্বিনী গো বদ্যিমশাই দাঁড়িয়ে কেন চুপটি করে
ঠাকুর হোথা তুলছে পটল বাঁচাও তারে যুক্তি করে ॥

[অশ্বিনী কর্তৃক রোগ পরীক্ষাদি]

অশ্বিনী। বদ্যি রাজা ধন্বন্তরি শিষ্য হয়ে স্মরণ করি
তোমার নামে মন্ত্র পড়ি হাতে নিলাম জ্যান্ত বড়ি
প্রেত পিশাচ শুদ্ধি হোক যেই খাবে তার বুদ্ধি হোক
রুষ্ট বায়ু ক্ষান্ত হও মরা মানুষ জ্যান্ত হও
মুক্ত হবে পিত্ত দোষ নিত্য রবে চিত্ততোষ
লুপ্ত নাড়ি শক্ত বেশ উঠবে কেঁচে পক্ক কেশ।

ঘুচবে পিলে ছুটবে বাত ফোকলা মুখে উঠবে দাঁত।
রাত্রি দিনে ফুর্তি রবে কার্তিকেরি মূর্তি হবে॥
কিন্তু যারা মিথ্যা কয় নাইকো যাদের চিত্তে ভয়
মিথ্যা রোগের নিত্য ভান ওষুধ তাদের মৃত্যুবাণ।
রোগ যেথা নয় সত্যিকার তোর পরে নাই ভক্তি যার
জ্যান্ত বড়ি বিষ বড়ি কণ্ঠে তাদের দিস দড়ি।
নয়কো যে-জন শান্ত রকম হয় যেন সে জ্যান্ত জখম—
নিত্য কোঁদল বন্ধ রবে চক্ষু দুটি অন্ধ হবে,
জ্বলবে গরল তিক্ত ধারা নাচবে রোগী ক্ষিপ্ত পারা,
গণ্ডে ফোড়া তুণ্ডে বাত ভণ্ডজনের মুণ্ড পাত!
ও বড়ি তুই নিদান কর বিচার বুঝে বিধান কর
কপট রোগী খবরদার ওষুধ আমার সমঝদার।

[নারদের গাত্রোত্থান]

নারদ। গা-ঝিমঝিম মাথা ঘোরা একেবারে কেটে গেল
মূর্ছা আমার আপনি সারে ওষুধটা কেউ চেটে ফেল।
হায় রে হায় কলির ফেরে দেবতা গুরু ভোগ না পায়
যার লাগি লোক চুরি করে চোর বলে সে চোখ পাকায়।
তোদের ভেবেই শরীর মাটি রাত্রে আমার ঘুমটি নেই
তোদের ছেড়ে জগৎ যেন ব্যঞ্জনেতে নুনটি নেই।
তোদের তরেই মূর্ছা গেলাম, তোদের তরেই প্রাণটি ধরি
তোরাই আমার মাথার মানিক তোরাই আমার
কলসী দড়ি।

এই কি তোদের দেবতাগিরি এই কি সাহস জ্বলন্ত !
ছুয়ো দেবতা ছুয়ো ইন্দ্র দেবতা কুলের কলঙ্ক !

[গান]

বীণা রে এই কি রে তোর সেই সনাতন দেবতা এরা

বৃহস্পতি । রাখ তোমার বকর বকর ভগ্ন ঢেঁকির কচকচি
মিথ্যে তুমি পেচাল পাড় বাক্য ঝাড় দশগজি
ঐদিকে যে বিশ্ব ডোবে বাণ ডেকেছে সৃষ্টিতে
লুটিয়ে গেল চুকিয়ে গেল শব্দ বাণের বৃষ্টিতে।
অর্থ হারা শব্দ ফেরে স্থাবর হতে জঙ্গমে
বিশ্বব্যাপার উধাও হল শব্দ সাগর সঙ্গমে
ঘূর্ণি পাকের ছন্দ জাগে গুপ্তগম্ভীর গর্জনে
মুক্ত কৃপাণ শক্তি মাতে অর্থ মহিষ মর্দনে।
ভ্রান্তিকালের বান্তি বাজে স্বর্গ-মর্ত্য ফক্কিকার
ধাক্কা লাগে গোলকধামে রোধ করে তায় শক্তি কার॥
শব্দ ধারার বর্ষা যেন কৃষ্ণ ভাদ্র অষ্টমী
শীঘ্র দেখ ছিদ্র খুঁজে কার এ সকল নষ্টামী॥

গুরুজি । ওরে বাস্ রে ! এমনি ব্যাপার ? আর কি
আছে রক্ষে ?
আরেক টুকুন সবুর কর দেখবে ধোঁয়া চক্ষে
মন্ত্র নাচে ছন্দ নাচে শব্দ নাচে রঙ্গে
বুকের শব্দ শোষণ করে রক্ত ধারার সঙ্গে

দেখবে ক্রমে শব্দ জমে হাত-পা হবে ঠাণ্ডা
শক্ত কঠিন শব্দ দিয়ে মারবে মাথায় ডাণ্ডা—
অর্থ বাঁধন হুড়কো ভেঙে শব্দ এল পশ্চিমে
যার খুশি হয় বসে থাক আমরা দ'দা বসছিনে ॥

[সকলের প্রস্থান]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

স্বর্গপথে সশিষ্য গুরুজি—বহু পশ্চাতে বিশ্বম্ভর]

বিশ্বকর্মা।

আদিকাল হতে বিশ্ব ঘোরে মহাচক্র পথে,
চক্রে চলে জলস্থল, চক্রে ঘোরে ভূমণ্ডল
সেই চক্রে চির গণ্ডি ঘেরা শব্দ করে চলা ফেরা।
মহাকাল ফেরে শূন্যে বস্তুরূপ মাগি, স্পর্শে তার শব্দ ওঠে জাগি
অর্থ তারে চক্র পথে টানি ঘোরায় আপন ঘানি—
বাক-অর্থ দোঁহে যুক্ত নিত্য বসবাস ইতি কালিদাস ॥
আজ কেন রুদ্ধ পথ খুলে মন্ত্রাঘাত করি শব্দ মূলে
ছিন্ন করে শব্দের বাঁধন—অসাধ্য সাধন!
কাল চক্র ব্যূহ ভেদ করি উর্ধ্বগতি কুণ্ডলীর মুক্ত পথ ধরি
জাগে ঐ নিদ্রিত অশনি— হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনি!
অন্ধকার রাতে অঙ্গহীন শব্দের পশ্চাতে
কার তপ্ত নিশ্বাসের রুদ্ধ অভিশাপ জপিছে প্রলাপ?

[বিশ্বকর্মার মন্ত্রপাঠ]

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং   ইটপাটকেল চিত পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি   নো এ্যাড্‌মিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা   নেই মামা তাই কানা মামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি   ধর্মতলা কর্মখালি
চানে বাদাম সর্দি কাশি   ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।

গুরুজি। দাঁড়াও আমাদের গতি যে ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসছে সেটা কি তোমরা অনুভব করেছ ?

সকলে। আজ্ঞে—ক্রমশই কমে আসছে—

গুরুজি। এর কি কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারছ ? কেউ কি পশ্চাতে পড়ে থাকছ ?

বেহারী। আজ্ঞে, আপনার পরেই এই তো আমি আসছি—

হরেকানন্দ। তার পরেই আমি শ্রীহরেকানন্দ—

জগাই। তার পর আমি জগাই—

পটলা। তার পর আমি—

গুরুজি। তবে এর কারণ কি ? শব্দের আকর্ষণটা বেশ অনুভব করছ কি ?

পটলা। আজ্ঞে, আমার বাক্য পিছন দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

গুরুজি। সর্বনাশ !—তবে একবার নির্বিশেষ মন্ত্রটা বেশ করে উচ্চারণ করে শক্তি সঞ্চার করে—তারপর তাকিয়ে দেখ কিছু দেখা যায় কিনা—

সকলে। গৌগাবৌগাবঃ—গৌগাবৌগাবঃ—গৌগাবৌগাবঃ—

বিশ্বম্ভর। ইত্যমরঃ

সকলে। কে শব্দ করে?

পটলা। সেই লোকটা!

সকলে। সর্বনাশ! ও আবার চায় কি?

বিশ্বম্ভর। ঐ যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ সেইখেনে যাব।

গুরুজি। বৎস বিশ্বম্ভর, তুমি আসলেই যদি, তবে এমন পশ্চাতে পড়ে থাকছ কেন?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে—বেজায় পরিশ্রম লাগছে—

গুরুজি। কেন? তুমি কি সম্যকরূপে মন্ত্রে আরোহণ করতে পার নাই? তুমি কি কোনোরূপ ভার বহন করে আনছ?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে—এই শরীরটা—

গুরুজি। ওসব ছেড়ে দাও—কিছুক্ষণ ধুকধুক মন্ত্র জপ কর—ও সব স্থূল সংস্কার কেটে যাবে—

[ছাত্রগণের মন্ত্রজপ]

বিশ্বম্ভর। আমি ভাবছিলুম—

সকলে। ভাবছিলে?৷ সর্বনাশ!—সর্বনাশ! ভেব না, ভেব না—

গুরুজি। শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপাচ্ছ—? ছিঃ! এমন করে শব্দশক্তি ম্লান কোরো না—আমার পূর্ব-উপদেশ স্মরণ কর—শব্দের সঙ্গে তার অর্থের যে একটা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ আছে সাধারণ লোকে সেটা ধরতে পারে না।

বেহারী। তাদের শব্দজ্ঞান উজ্জ্বল হয়নি—

হরেকানন্দ। তারা শব্দের রূপটিকে ধরতে জানে না—

গুরুজি। তারা ধরে তার অর্থকে। তারা শব্দ চক্রের আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন কর্মবন্ধন, যেমন মোহবন্ধন, যেমন সংসারবন্ধন, তেমনি শব্দবন্ধন!

সকলে। শব্দবন্ধনে পড় না—পড় না—

গুরুজি। শব্দকে যে অর্থ দিয়ে ভোলায়—সে অর্থপিশাচ। শব্দকে আটকাতে গিয়ে সে নিজেই আটকা পড়ে। নিজেকেও ঠকায় শব্দকেও বঞ্চিত করে : সে কেমন জানো? এই মনে কর, তুমি বললে 'পৃথিবী'—তার অর্থ করে দেখ দেখি?—সূর্য নয় চন্দ্র নয় আকাশ নয় পাতাল নয়—সব বাদ—শুধু পৃথিবী! এরা নয় ওরা নয় তারা নয়—এসব কি উচিত? আবার যদি বল 'পৃথিবী গোল'—তার সঙ্গে অর্থ জুড়ে দেখ দেখি, কি ভয়ানক সংকীর্ণতা!—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা বলা হল না—পৃথিবীর উত্তরে কি দক্ষিণে কি, তা বলা হল না—তার তিনভাগ জল একভাগ স্থল, তা বলা হল না—তবে বলা হল কি? গোটা পৃথিবী-টার সবই তো বাদ গেল! এটা কি ভালো?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে না—এটা তো ভালো ঠেকছে না—তাহলে কি করা যায়?

গুরুজি। তাই বলেছিলাম—শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ, আগে তাকে ভাঙো। শুধু পৃথিবী নয়, শুধু গোল নয়, শুধু এটা নয়, শুধু ওটা নয়; আবার এটাই ওটা, ওটাই সেটা—তাও

নয়। তবে কী? না সবই সব। তাকেই আমরা বলি গৌ
গাবৌ গাবঃ—

[গৌ গাবৌ গাবঃ—
হলদে সবজ ওরাং ওটাং—ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ]

[বিশ্বকর্মার আবির্ভাব]

বিশ্বকর্মা।

নিঝুম তিমির তীরে শব্দ হারা অর্থ আসে ফিরে
কালের বাঁধন টুটে দশদিশি কেঁদে ওঠে
দশদিকে ওড়ে শব্দ ধূলি উড়ে যায় উড়ে যায় মোক্ষপথ
ভুলি—
ভেবেছ কি উদ্ধতের হবে না শাসন? জাগেনি কি সুপ্ত
হুতাশন?
বিদ্রোহের বাজেনি সানাই? শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই?
শব্দ মুখে প্রতিলোম শক্তি এস ঘিরে কুণ্ডলার মুখ
যাও ফিরে
শব্দঘন অন্ধকার নিত্য অর্থভারে নামে বৃষ্টি ধারে
শব্দ যজ্ঞ হবিকুণ্ড অফুরন্ত ধূম এই মারি শব্দকল্পদ্রুম।

['দ্রুম' শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন]

॥ যবনিকা পতন ॥

'ঝালাপালা' আর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' সুকুমার রায় রচনা করেছিলেন যখন তাঁর বছর কুড়ি বয়স। 'অবাক জলপান' আর 'হিংসুটে'—এ দুটি নাটক রচনা হয়েছিল সন্দেশ সম্পাদনাকালে। 'চলচিত্তচঞ্চরি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যায়। 'ভাবুক সভা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২১ সালে। 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' রচিত হয়েছিল ১৩২১ সালে।